তৃতীয় অধ্যায়

নিবিড় পাঠঃ ত্রৈলোক্যনাথের গল্প

ক) সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, রাষ্ট্রীয় পট-চিত্র,
ত্রৈলোক্যনাথের মেজাজ ও মর্জি, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

খ) নির্বাচিত পাঁচটি গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণঃ

১.'নয়নচাঁদের ব্যবসা'
২.'লুল্লু'
৩.'স্বদেশী কোম্পানী'
৪.'ঢাক মহাশয়'
৫.'গাছে-ঝোলা সাধু'

গ) রচনারীতি উপস্থাপনের ভঙ্গি ও গল্প বলার কৌশল

তৃতীয় অধ্যায় (ক)

৩.(ক) ত্রৈলোক্যনাথের অবির্ভাবকাল, মেজাজ ও মর্জি, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, বাংলা গল্পের ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে তাঁর হাসির গল্পের সমাজবীক্ষার স্বরূপঃ

ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ১৯১৯-এ। অর্থাৎ পরাধীন দেশেই তাঁর জন্ম, পরাধীন দেশেই তাঁর মৃত্যু। স্বাধীন ভারতবর্ষ তিনি দেখে যেতে পারেননি, দ্যাখেননি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আর্থিক সঙ্কট, দাঙ্গা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বস্ত্র ও খাদ্যসঙ্কট, দেশভাগ, উদ্বাস্তু-স্রোত ও ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বাধীনতা। কিন্তু যা দেখেছেন, যেটুকু দেখেছেন তার মূল্যও কিছু ন্যূন নয়। পরাধীন ভারতবর্ষেই স্বদেশী সমাজের যে চেহারা ও জীবনপ্রবাহ তিনি দেখেছেন, তাই-ই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার। সেই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভান্ডার উজাড় করেই তিনি সাহিত্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ বেড়ে ওঠার বয়সে, কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে সবচেয়ে যে যুগপ্লাবী ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন তা হলো সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)। সেই ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও পরবর্তীকালে তাঁর মানসগঠনে নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। এর ঠিক চারবছর পরেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম (১৮৬১) বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ত্রৈলোক্যনাথের জন্মের আগেই ঘটে গেছে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭), বাংলার নবজাগরণে যে প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য, ১৮২৯-এ ঘটে গেছে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, তাঁর জন্মের দু'বছর পরে (১৮৪৯) বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা, যা বাংলার রেনেসাঁ ও নারীপ্রগতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ত্রৈলোক্যনাথের শৈশবেই ঘটেছে হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন পাশ (১৮৫৬)-এর মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঠিক এর পরের বছরেই (১৮৫৭) সিপাহীবিদ্রোহী বা মহাবিদ্রোহ। ফলে, একদিকে বৃটিশ-বিরোধী গণবিক্ষোভের উত্তাল ঘটনা, অন্যদিকে বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ঘটে গেছে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলি। ত্রৈলোক্যনাথ যখন পরিণত যুবক, সেই সময়েই ঘটেছে জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠা, যে সংগঠনের মঞ্চ থেকে পরবর্তীকালের বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারাটি সংগঠিত হয়েছে।

বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি, যার অধিকাংশই বঙ্গীয় নবজাগরণের অবদান; সবই ত্রৈলোক্যনাথের কৈশোর থেকে যৌবনে বিকাশের কালপর্বে ঘটেছে। যেমন, বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধকাব্য'(১৮৬১) যখন প্রকাশিত হয়, ত্রৈলোক্যনাথ তখন ১৪ বছরের কিশোর; মধুসূদনের নাটকগুলি এর আগেই বেরিয়ে গেছে। হিন্দু কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও শক্তিশালী নাটক 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪) বেরিয়েছে ত্রৈলোক্যনাথের বাল্যকালে। নিশ্চয়ই যৌবনপ্রাপ্তির পর এইসব কালজয়ী সাহিত্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, বাংলা কথাসাহিত্য তথা শিল্পসম্মত উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলি ত্রৈলোক্যনাথের যৌবনোন্মেষ থেকে পরিণত যৌবনের কালপর্বে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বেরিয়েছে ১৮৬৫ সালে, এবং শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এর প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ। বাংলা গদ্যসাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাহন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭২-এ। এর সামান্য পরে বাংলা গীতিকাব্য ধারার ঐতিহাসিক সূচনা ঘটছে বিহারীলালের হাতে। তাঁর 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) কাব্যেই বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম স্বাধীন স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ঊনিশ শতকের একদম শেষ দশকে প্রকাশিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যপর্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি 'মানসী'(১৮৯০), 'সোনারতরী'(১৮৯৪), 'চিত্রা'(১৮৯৬) ও'চৈতালি' (১৮৯৬)। ঊনিশ শতকের এই শেষ দশকেই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর প্রথম পর্বের গল্পগুলি (যার অধিকাংশই 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং 'ছিন্নপত্র'-এর চিঠি। সুতরাং মধ্যবয়সে পৌঁছে ত্রৈলোক্যনাথ যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর কালগত সীমা অতিক্রম ক'রে বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হচ্ছেন, তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক 'এলিট' সাহিত্যের ঐতিহ্য(আমরা যথাযথ বিবেচনায় 'এলিট সাহিত্য'শব্দটি ব্যবহার করছি কারণ ত্রৈলোক্যনাথ ঠিক এর বিপরীত ধারায় লোকপ্রচলিত মৌখিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর নিজস্ব শিল্পসৌধ গড়ে নিয়েছিলেন) তাঁর শিল্পচেতনার পুষ্টিসাধনে সক্রিয় থেকেছে। তবে, সাহিত্যের এই প্রধান ধারা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। বলা প্রয়োজন তাঁর প্রথম রচনা 'কঙ্কাবতী'র প্রকাশ ১৮৯২-তে, তার আগে রবীন্দ্রনাথের দু'টি উপন্যাস বেরিয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাতীয় ও বঙ্গীয় রাজনীতি এবং বাংলা কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন(১৯০৫) এবং 'চোখের বালি'(১৯০৩) উপন্যাসের প্রকাশ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বিদেশী পণ্য-বিরোধী প্রচার এবং নানাবিধ স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা দিয়েছে যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ত্রৈলোক্যনাথের 'লুল্লু', 'স্বদেশী কোম্পানী' প্রভৃতি গল্পে অনুভূত হয়েছে। তবে, ত্রৈলোক্যনাথ দেখিয়েছেন যে, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বেশ আগে থেকেই এদেশীয় বুদ্ধিজীবী ও বণিকদের মধ্যে বিদেশী পণ্য সম্পর্কে পরোক্ষ ক্ষোভ

সঞ্চিত অবস্থায় ছিল। বৃটিশ বণিকের রেলপথ নির্মাণ ও ১৮৫৪-১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে পরিষেবা চালুর ঘটনা নিয়েও যে এদেশীয়দের মনে নানা সংশয় ও বক্র মনোভাব সক্রিয় ছিল, তা 'লুল্লু' গল্পের ভূতের মুখেই শোনা গেছে। যাইহোক, এই সময়েই (১৮৫৫) হাওড়া-হুগলীতে শিল্পায়ন শুরু হয়, কয়লাখনির বিকাশ হয়, অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি আকস্মিক কর্মচ্যুতি (ছাঁটাই) ও বেকার সমস্যাও দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। একইসঙ্গে, মূল ধারার পাশাপাশি সমান্তরাল ধারায় গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতার আন্দোলনও দানা বাঁধতে থাকে (যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ)। ত্রৈলোক্যনাথের শেষ জীবনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ(১৯১৪-১৯১৮) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মাগান্ধির ভারতীয় রাজনীতির পটভূমিতে প্রবেশ (১৯১৫)। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর সামান্য আগেই ঘটে যায় রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯)। এর পরের ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত গতিতে বৃটিশ-বিরোধী উত্তাল স্বাধীনতার আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং খন্ডিত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তা প্রত্যক্ষ করার জন্য আর ত্রৈলোক্যনাথ জীবিত ছিলেন না।

ত্রৈলোক্যনাথ পরাধীন দেশে জন্মেছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগও পরাধীন দেশের নাগরিক হিসেবেই। তাঁর চেতনা বিকাশের পর্বে, যৌবনপ্রাপ্তির পরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটের নানা উত্তুঙ্গ ঘটনা তাঁর মনোভূমি গঠনে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে। একইসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা, দুঃখদারিদ্রপূর্ণ তাঁর জীবনের নানা ঝুঁকিপূর্ণ রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা, ক্ষুধা ও ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতার কথা। প্রতিষ্ঠা যেমন তিনি বেশি বয়সে পেয়েছেন, তেমনি লেখালেখিও শুরু করেছেন প্রৌঢ় বয়সে, অবসরের সামান্য পূর্বে, ফলে যৌবনের আবেগ-মত্ততা বা অস্থিরচিত্ততার ছাপ তাঁর লেখায় নেই, বরং স্থিতধী ব্যবস্থিতচিত্ত (organised mentality) শিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির এইসব উত্তাল ঘটনা তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে তেমন কোনো অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করেনি। তীব্র বৃটিশ-বিরোধী প্রসঙ্গ তাঁর গল্পে নেই বললেই চলে। বরং বৃটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার যে এদেশের দীর্ঘলালিত অন্ধকার মোচনে সহায়ক, এমন ধারণা পোষণ করেছেন। ভূতের সঙ্গে আমীরের কথোপকথনে তারই প্রমাণ মেলে।

ত্রৈলোক্যনাথকে খুব বেশি পরিমাণে ভাবিয়েছে ও ক্ষুব্ধ করেছে স্বদেশী সমাজের নানা কুসংস্কার ও অমানবিক কুপ্রথা। তিনি যেসময়ে গল্প লেখা শুরু করেছেন, তার অন্ততঃ চার দশক আগে বিধবাবিবাহ আইন, বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন, সতীদাহ-নিষিদ্ধকরণ আইন চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে যে এসব আইনের কোনো প্রভাবই পড়েনি, বরং কুসংস্কারগ্রস্ত প্রথানুগত সমাজ এইসব কুপ্রথাকে মান্যতা দিচ্ছে, লালন করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'ঢাকমহাশয়'-এর মতো গল্পে। বিদেশযাত্রা ছিল সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ঘোরতর অধর্মাচরণ, কারণ এতে নাকি 'কালাপানি' পেরতে হয়। তাই কালাপানি পার হওয়া রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ; নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথকেও করতে হয়েছিল। এইসব কুপ্রথাও তাঁর গল্পে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

মাত্র ১৮টাকা বেতনে বীরভূমের দ্বারকা গ্রামে এক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের চাকরি নিয়েছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। সে-সময়টা তাঁর কর্মজীবনের সূচনা, নিজেকে গড়ে নেবার সময়। চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর ভয়াবহতা, ওই অঞ্চলে পথে-ঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকে। বাড়িতে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ভাই, প্রায়শঃই অনাহারে থাকে। বেতনের টাকায় সংসার চলে না। বাড়িতে আরও বেশি পরিমাণে টাকা পাঠানোর জন্য একবেলা উপবাসের অভ্যাস রপ্ত করলেন, কাপড় না প'রে গেরুয়া পরিধানে অভ্যস্ত হলেন। সে-সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন—

"তখন যৌবনের প্রারম্ভ— অতিশয় ক্ষুধা। এক একদিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীগণের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে পাঠাইতাম।"

এই বর্ণনা থেকেই ত্রৈলোক্যনাথের জীবনদর্শনের পটভূমিটি বুঝে নেওয়া যায় যার মধ্যে পরোপচিকীর্ষা, পরের উপকারের জন্য স্বেচ্ছায় ক্লেশ বরণ এবং সামাজিক দায়বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এর থেকেই, এবং অন্যান্য বিবরণ থেকেও বোঝা যায় যে, দারিদ্র, ক্ষুধা ও সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাই ছিল সেকালের সমাজের কঠোর বাস্তব। তার পাশাপাশি ছিল মানুষের ধর্মভীরুতা নিয়ে হৃদয়হীন ব্যবসা, মন্ত্রবলে টাকা ডবল করে দেবার মতো বুজরুকি ও নানা লোকঠকানো ব্যবসা। লুল্লু','নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'গাছে ঝোলা সাধু' ,'স্বদেশী কোম্পানী', প্রভৃতি গল্পে এই সমাজেরই ছবি ফুটে উঠেছে। কখনো প্রত্যক্ষ লৌকিক ঘটনার সাহায্যে, কখনো বা লৌকিক-অলৌকিক আবরণের সাহায্যে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে স্বদেশী সমাজের

এইসব অন্ধকার দিক ফুটে উঠেছে। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের আত্মম্ভরী কিন্তু মূর্খ ব্রাহ্মণ তনু রায়ের কথা এ, প্রসঙ্গে মনে পড়বে। তনু রায় টাকার লোভে নিজের বালিকা কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিল যথাক্রমে ৭০ ও ৭৫ বছরের দুই বৃদ্ধের সঙ্গে , একবছরের মধ্যেই তারা বৈধব্য বরণ করতে বাধ্য হয়। তনু রায় বা ঢাক মহাশয়কে দেখলে বোঝা যায় ব্রাহ্মণ্য -শাসিত বঙ্গসমাজের প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের কতখানি বেদনামিশ্রিত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে, উনিশ শতকের সমাজ-সমস্কার আন্দোলনগুলির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল, বিজ্ঞানচেতনার ও যুক্তিবোধের প্রসার আরও বেশি ঘটুক এটা তিনি চেয়েছেন কিন্তু সমাজটা ভেতরে-ভেতরে যে বিশেষ বদলায়নি, সেই অনগ্রসরতাও ব্যঙ্গের দর্পণে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের আর এক লক্ষ্য হলো ইঙ্গবঙ্গ সমাজ। এই সমাজের প্রগতিশীলতা নয়, প্রদর্শনী-মানসিকতা, অন্ধ সাহেবিয়ানার অনুকরন, বাংলা ভাষাকে বিস্মৃত হ'য়ে কথায় কথায় ইংরেজি বুলি-আওড়ানো এই সাহেব-ঘেঁষার দলকে ত্রৈলোক্যনাথের মনে হয়েছে স্বধর্মচ্যুত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতই ব্যঙ্গবিদ্রূপে ঝলসে উঠেছে তাঁর কলম। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের ব্যঙ-সাহেব মিঃ গমিশ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ! ত্রৈলোক্যনাথকে ব্যথিত করেছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইসব ডিগ্রীধারী তরুণ ছাত্ররা, যারা নাকি সমাজের অগ্রসর শ্রেণী, যাদের সমাজকে আলো দেখাবার কথা, তারা যখন ধর্মীয় হুজুগে মেতে ওঠে, কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে গৌরবান্বিত করতে চায়! এমনকি ইংরেজি সংবাদপত্রের সাংবাদিকরাও যে এই হুজুগ থেকে মুক্ত নয়, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সভ্যতাগর্বী ইংরেজি সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও ধর্মব্যবসা নিয়ে হুজুগে মাতামাতি করছে- এই বৈপরীত্যও তাঁর সামাজিক আক্রমণের বিষয় হয়েছে।

বৃটিশ-প্রবর্তিত এবং পরিচালিত বিচারব্যবস্থার প্রহসন ও অবিচার ত্রৈলোক্যনাথকে কতখানি ক্ষুব্ধ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গল্পের বিচারদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করলে! তাঁর গল্পের বিচারদৃশ্যগুলি সবই যমলোকের, যমরাজার বিচারই সেখানে চিত্রিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ দেখাতে চেয়েছেন যমরাজের বিচারে কেবল সৎ ও নিরীহ মানুষরাই শাস্তি ভোগ করে, প্রকৃত অপরাধীরা নরকভোগের পরিবর্তে স্বর্গলোকে প্রবেশাধিকার পায়। তাছাড়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে পাপ-পুণ্যের মূল্যবোধ যে কত ঠুনকো তাও দেখাতে চেয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ এইসব বিচারদৃশ্যে। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' বা 'ডমরুচরিত' গল্পের যমপুরীর দৃশ্যগুলি এ'প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বর্তমান অধ্যায়ের শেষে আমরা সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ত্রৈলোক্যনাথ-সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন স্মরণ করতে পারি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের সমাজবীক্ষার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"জাতি এবং দেশ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত অতিভাষণ ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যে হয়তো কোথাও নেই। তিনি প্রধানত গল্পকার এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গই তাঁর ব্যবহৃত মাধ্যম। তবু যে-পাঠক একটু সতর্কভাবে তাঁর সাহিত্যকে অনুধাবন করবেন— তিনিই অনুভব করবেন সরস মজলিশী গল্পের উচ্ছ্বসিত কৌতুকের আড়ালে কী নিবিড় নিগূঢ় বেদনা তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। তাঁর এই নেপথ্যবাহী অশ্রুধারা দেশ এবং জাতির প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি থেকেই উৎসারিত।....."[১]

এই মূল্যায়নেরই অন্য এক জায়গায় নারায়ণবাবু বলেছেন—

"ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায় বা দ্বিতীয় যুগটি স্বজাতি ও সমাজ সমালোচনায় বিশিষ্ট।.... রঙ্গ ও রসিকতার উপকরণে ত্রৈলোক্যনাথ আত্মসমালোচনা করেছেন— সেই আত্মনিরীক্ষার দর্পণে দেশের অনেক গ্লানি, অনেক ভন্ডামি, অনেক মিথ্যাচার প্রতিবিম্বিত হয়েছে।"[২]

যে-সমাজের অসঙ্গতি ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে, ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও সেই সমাজেরই অঙ্গ। সুতরাং এই সমালোচনাকে এক ধরনের আত্মসমালোচনা হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১. দ্র. বাংলা গল্পবিচিত্রা/ কলকাতা, ১৪০১/ চতুর্থ মুদ্রণ/ পৃঃ ৬
২. তদেব/ পৃঃ ৭

তৃতীয় অধ্যায় (খ)

[এই অধ্যায়ের বর্তমান 'খ'-শীর্ষক উপঅধ্যায়ে আমরা সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের সমাজবীক্ষার স্বরূপ বুঝতে চেয়েছি। সেইজন্য, নির্বাচিত গল্পের নিবিড় বিশ্লেষণের সাহায্যেই আমরা তাঁর সমাজবীক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছি। আমরা পূর্বেই বলেছি, দেশীয় আখ্যানরীতিতে রচিত ব'লে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির মধ্যে কোনো একটিকে একক মৌলিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন। কারণ, প্রত্যেকটি গল্পই ১০/১২ টি অধ্যায়ের গল্পমালায় এক ধারাবাহিক গল্পমালার সূত্রে গ্রথিত। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই এক একটি স্বতন্ত্র গল্প। সন্দর্ভের আয়তন যাতে অনাবশ্যক পৃথুল না হ'য়ে যায় তাই এই গল্পমালা থেকে সেই নির্দিষ্ট গল্পটি বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করেছি, যার মধ্যে তুলনামূলকভাবে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার অন্তঃসার নিহিত আছে। হয়তো আরও কিছু গল্পের নিবিড় পাঠ-ভিত্তিক বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেত, কিন্তু সেক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থেকে যেত। তাই সীমিতসংখ্যক নির্বাচিত গল্পের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা বর্তমান অধ্যায়ের মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইব।]

৩.(খ)১.গল্প-বিশ্লেষণঃ'নয়নচাঁদের ব্যবসা'(প্রথম প্রকাশ-'জন্মভূমি'পত্রিকার১৩০২,শ্রাবণসংখ্যায়)

['ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থে সংকলিত। 'ভূত ও মানুষ'-এর প্রকাশকাল—জানুয়ারি, ১৮৯৬]

'ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। এর প্রথম প্রকাশ 'জন্মভূমি'র শ্রাবণ সংখ্যায়, ১৩০২ সালে। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পে ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষা বেশ প্রতিবাদী ভাষায় শিল্পিত হয়েছে। যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার তাগিদে লেখককে দুঃসাহসিক জীবন-পরিক্রমার পথ হাঁটতে হয়েছে, সেই তাগিদ থেকেই ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছিলেন 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'-র মতো গল্প। যা কিছু অসত্য, অসুন্দর, যা কিছু কৃত্রিম ও ছদ্মবেশী তার প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের ছিল আন্তরিক অশ্রদ্ধা বা অপছন্দ। এই অশ্রদ্ধেয় বিষয়গুলি একান্তভাবে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তির জীবনাচরণের অন্তর্গত, তবে এসব অপছন্দের বিষয় জানাবার জন্য তিনি সমাজ বা রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন নি। সাধুতার ভাণধারী ছদ্মবেশী মানুষ ছিল ত্রৈলোক্যনাথের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। হাসির হালকা আবরণের মাধ্যমেই তিনি আমাদের সমাজ ও পরিবারজীবনের গভীর সত্যগুলি উচ্চারণের প্রয়াস রেখেছেন।

বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবনাচরণ ও দার্শনিক বিশ্বাসের সমগ্রতায় পাকে-চক্রে জড়িয়ে আছে ধর্মবিশ্বাস। এই ধর্মই আবার একশ্রেণীর ইতর ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসার প্রধান অবলম্বন। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা এবং নির্লজ্জভাবে নিরীহ গৃহস্থ মানুষদের প্রতারণা করা— এই দু'টি দিকই আলোচ্য গল্পে প্রতিফলিত।

গল্পটির সমাজবীক্ষার স্বরূপ ও সমালোচনায় প্রবেশের পূর্বে গল্পটির কাহিনি সংক্ষেপ জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

কাহিনি-সংক্ষেপঃ

নয়নচাঁদের বাড়ি ফরাশডাঙ্গা। নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ সান্ধ্য আড্ডায় বসেছে। সেই সময় লম্বোদরের প্রশ্নের উত্তরে নয়নচাঁদ তার লোক-ঠকানো ব্যবসার কথা প্রকাশ করে। একবৎসর খেয়ে না-খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। এমন সময় কলকাতায় মহামারী রূপে বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটল। দিকবিদিক চিন্তা না ক'রে জলা থেকে এঁটেল মাটি দিয়ে শীতলার মূর্তি তৈরি ক'রে সিঁদুর মাখিয়ে রাঙতা দিয়ে ছোট-বড় বসন্তের গুটি তৈরি ক'রে শীতলার মূর্তিতে প্রলেপ দিল। যেন শীতলাই গুরুতর বসন্ত রোগে আক্রান্ত। শীতলামূর্তিসহ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নয়নচাঁদ কলকাতায় চলে এলো। সেখানে একটি ঘরও ভাড়া নেয়। লৌকিক ব্রতকথার ছড়ার ন্যায় একটি মৌখিক ছড়া রচনা করে। এটা নয়নচাঁদের তাৎক্ষণিক প্রতিভার পরিচয়। শীতলামূর্তি হাতে নিয়ে প্রতিদিন ভিক্ষায় বের হ'য়ে ঘরে ঘরে ব্রতকথা শোনায়। বসন্তের ভয়ে দলে দলে লোক শীতলার পূজা দেয়, আর নয়নচাঁদও 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হ'য়ে ওঠে। নয়নচাঁদের শীতলা পুজোর ব্যবসা, নয়নচাঁদের শীতলা কেড়ে নেওয়া, সেই গল্পে মিত্তিরজা, মিত্তিরজা কর্তৃক যমপুরীতে এঁড়ে ষাঁড়কে দিয়ে যমপুরীর সমস্ত নিয়মকে ভঙ্গ ক'রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, নেই আঁকুড়ে দাদার উপস্থিতি প্রভৃতি এর সঙ্গে লগ্ন গল্পমালার বিভিন্ন গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

মিত্তিরজা মৃত্যুকালে যমদূতকে দেখে পুণ্যলাভের জন্য এঁড়ে বাছুর ব্রাহ্মণকে দান করেছিল। রাস্তায় বাছুরটি মারা যায়। এদিকে মিত্তিরজা মৃত্যুর পর যমপুরীতে হাজির হয়। চিত্রগুপ্ত কর্তৃক মিত্তিরজার পাপ-পুণ্যের হিসেবে দেখা যায় পুণ্যের ভাগ অতি সামান্য, তাই যমরাজের কথামতো পুণ্যের অংশটুকু মিত্তিরজা আগে ভোগ করতে চায়। যমপুরীতে এঁড়ে ষাঁড়কে দিয়ে যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের -শাস্তিবিধান, যমের সিংহাসনে বসে পাপীদের মুক্তি দান, যমলোক ও স্বর্গলোকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ক'রে বৈকুণ্ঠে বাস করার অধিকার অর্জন করে। কিন্তু নয়নচাঁদের শীতলা কেড়ে নেওয়ার অপরাধে যে পাপ হয়েছিল

তার জন্য সে স্বর্গলোকে যেতে পারে নি। তাই ভূত হ'য়ে পুনরায় মর্ত্যে ফিরে আসে, নয়নচাঁদের শীতলা ফিরিয়ে দেয়। তারপর নয়নের চোখের সামনেই সরু সরু বাঁশের সলার মত লম্বা হয়ে সোঁ সোঁ ক'রে উপরে উঠে স্বর্গলোকে চলে যায়।

নেই আঁকুড়ে দাদার বিধবা ভগ্নী একাদশীর দিন আঙট কলাপাতায় ভাত খাবার কথা ভেবেছিল, সেই আপরাধে যমরাজ তার মাথায় ডাঙস পেটার নির্দেশ দেন। এরপর নেই আঁকুড়ে দাদা জীবন্ত দেহেই যমপুরীতে যাবার পথে নানারকম পুণ্য কাজ করার কথা ভাবেন, অন্ততঃ যমদূতদের সামনে তেমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি করেন এবং যমপুরীতে গিয়ে যমরাজকে বুঝিয়ে দেন শুধু খাবার কথা ভাবলেই যদি পাপের শাস্তি হয় তবে পুণ্যের কথা ভাবলেও পুণ্যের পুরস্কার দিতে হবে।

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটির শেষপর্বে শিক্ষিত সমাজও যে ধর্মের অন্ধমোহে প'ড়ে যুক্তি-বুদ্ধি ন্যায় নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে নয়নচাঁদের কথায় তা স্পষ্ট হয়েছে— "আগে যদি একগুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কলেজের সেই যারা এম.এ. পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল।"[১]

গল্পের দর্পণে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার স্বরূপঃ

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' ধর্মব্যবসায়ীর অসাধুতার গল্প। চতুর ধুরন্ধর ধর্মব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত দেশে ধর্মভীরুতাকে সম্বল ক'রে সাধারণ মানুষকে কীভাবে ধাপ্পা দেয় ও লোক ঠকায়, তাদের স্বরূপ কিছুটা যেন চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন লেখক এই গল্পের দর্পণে। ধর্মভীরুতার জন্যই ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ দুর্বলচিত্ত।

এদেশের মানুষ সাধারণভাবে ঐহিক সুখ ও ইচ্ছাপূরণের জন্য ঠাকুরদেবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ যে দেবতার পূজা না করলে কালান্তক ব্যাধি গ্রাস করবে, সেই দেবতাকে নিয়ে ব্যবসা করা সহজ। কারণ, শীতলার নামই হলো 'কাঁচাখেকো দেবতা' এবং সময়টা মহামারীর সময়। বসন্ত রোগ তখনও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, এই রোগ সম্পর্কে মানুষের আতঙ্ক প্রবল।

বসন্ত রোগের উৎস ও প্রতিকার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের প্রচলিত লোকধর্ম ও লোকবিশ্বাসকে পুঁজি ক'রে নয়নচাঁদ দু'পয়সা কামিয়ে নেবার সুলভ বৃত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, মাটির শীতলার গায়ে সে রাঙতার প্রলেপ দিয়ে বসন্তের গুটি তৈরি করেছে, কিন্তু নিজের ব্যাপারে তার কোনো ভয়ভীতি ছিল না। লেখকের বর্ণনা লক্ষণীয়—

"জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটি নিয়ে আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানা টানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট-বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম।"[২] কলকাতায় পৌছানোর পর নয়নচাঁদ দেখল বসন্ত রোগের ভয়ে লোক কাঁটা হ'য়ে আছে। আর সেই সুযোগে শীতলা মূর্তিটি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে লাগল। নয়নচাঁদের বয়ানে— "পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়। আমার অভিপ্রায় যে,মরসুম থাকিতে থাকিতে দু-পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইয়ার-বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি।"[৩]

আগেই বলেছি, সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধর্মব্যবসায়ীরা চিরকালই পসার জমিয়ে চলেছে! নয়নচাঁদ ধর্মব্যবসায়ীদেরই একজন।

এছাড়া এ'গল্পে আরও দু'টি প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে যেগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজ-ভাবনার ফলশ্রুতি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। প্রসঙ্গ দু'টি হলো—

১. নেই আঁকুড়ে দাদা-র বিধবা ভগ্নীর একাদশীর দিন ভাত খাবার বাসনা পোষণ করা এবং তার জন্য যমলোকে যমরাজ-কর্তৃক তার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারার হুকুম প্রদান।

২. চতুর বুদ্ধিতে মিত্তিরজা-র যমরাজকে পর্যুদস্ত করা এবং যমরাজের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে তার শূন্য সিংহাসন দখল করা।

এই দু'টি বিষয়ে আমাদের পঠন-অভিজ্ঞতাকে একটু বিশদে জানানো যেতে পারে।

প্রথমত, বিধবা ভগ্নীর একাদশীর দিন ভাত খাবার বাসনা সমাজে বৈধব্যের ওপর পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে-দেওয়া আচরণবিধির অনিবার্য জৈবিক প্রতিক্রিয়া। এ'গল্প যখন ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন তখন বিধবাবিবাহ আইন বেশ পুরনো হ'য়ে গেছে এবং বিদ্যাসাগরের এ'সংক্রান্ত আন্দোলন তখন অতীত-চর্চার বিষয়। কিন্তু অভ্যন্তরের চেহারাটা যে বিশেষ বদলায়নি, তার প্রমাণ ওই নারীর ভাত খাবার বাসনার উল্লেখে এবং সমাজের অভিভাবক তথা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও পুরুষতন্ত্র তার এই আশাস্ত্রীয় আচরণ তথা বেয়াদপির কী শাস্তি দিতে পারে তার উল্লেখ যমরাজের ডাঙ্গস মারার নির্দেশে। যমরাজ-

কর্তৃক বিধবার শাস্তিবিধানের ঘটনাটি প্রতীকী। ওই ঘটনার মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথ সেকালের সমাজে নারী নির্যাতনের, বিশেষত বিধবা নারীর ওপর পুরুষদের নির্যাতনের ছবি আঁকতে চেয়েছেন। প্রাকৃত-অপ্রাকৃতে মেশানো এই বর্ণনাটি আপাতদৃষ্টিতে কৌতুককর বলে মনে হলেও আসলে এটি ত্রৈলোক্যনাথের নিবিড় সমাজ-পর্যবেক্ষণ এবং গভীর মানব-সহানুভূতির নিদর্শন। এ'প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হলো, নেই আঁকুড়ে দাদার ওই বিধবাভগ্নী কিন্তু বিশেষভাবে একাদশীর দিনেই ভাত খেতে চায়নি, ভাত খেতে চেয়েছিল তার পরের দিন। অন্নগ্রহণের বাসনা তার জাগ্রত হয়েছিল একাদশীর উপবাসের দিনে, এইটুকুই তার অপরাধ। লেখকের বর্ণনা এখানে লক্ষণীয়—

"নেই আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ীর নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলাগাছে দিব্য একখানি আঙট পাতা হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে মানস করিলেন যে, কাল এই আঙট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব।"[৪]

সুতরাং যমরাজের শাস্তিদানের মধ্যে অবশ্যই কিছুটা অবিবেচনাপ্রসূত ত্রুটি র'য়ে গেছে, যদি এটাকে প্রচলিত আচরণবিধির নৈতিকতার মানদন্ডেও গ্রহণ করি। এ'প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালের রচনা 'ডমরুধর'-এর অন্তর্গত 'ঢাক মহাশয়' গল্পাংশটিতে এই একই সামাজিক অনাচারের প্রসঙ্গ এবং নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। প্রথমেই বলে রাখি যে, ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পেও ভূত-প্রেত, স্বর্গ-নরক, যম-যমদূত ইত্যাদি প্রসঙ্গ মজা জমিয়ে তোলার শিল্পকৌশল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নিবিড় অনুসন্ধানে এর মধ্যেও আমরা অন্য এক সত্যের সন্ধান পেতে পারি।

মিত্তির-জার পাপ-পুণ্যের হিসাব নেওয়ার পর দেখা গেল, চিত্রগুপ্তের খাতায় তার অ্যাকাউন্টে পাপের অঙ্কই ভারি, পুণ্যের ভাগ নিতান্তই কম। মৃত্যুর আগে সে যে কৃশকায় একটি এঁড়ে বাছুর জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেছিল, সেই সূত্রেই তার সামান্য একটু পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে। প্রথমে সে পুণ্যের ফলভোগ করতে চাইল। যমরাজ তাকে জানালেন যে, ওই পুণ্যের সুবাদে সে ওই গরুটিকে দিয়ে (এখন সে হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়) যা খুশি করিয়ে নিতে পারে। ষাঁড়টিও তাকে একই কথা জানালো। তখন চতুর বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে ধূর্ত মিত্তিরজা ষাঁড়কে বলল—

"এঁড়ে গরু। তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার একটি শিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি কিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুন্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে বন্ বন্ করিয়া চরকীর পাক খাওয়াও।"[৫]

তাই ঘটল। বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ-র মতো ষাঁড়টি যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে শিং উঁচিয়ে তাড়া করল, আর যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলেন। যমরাজের সিংহাসন শূন্য প'ড়ে রইল। তারপর—

"যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুক করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূত- দিগকে হুকুম দিলাম—" যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাশ কর।"[৬]

সন্দেহ নেই, এই বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে হাসির উপাদান নিহিত আছে। এর নিহিত মজাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করেও আমরা এই ঘটনাটিকে ভিন্ন তাৎপর্যে দেখতে পারি। যমরাজকে অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং মিত্তিরজাকে যদি শাসিতের রূপকে দেখা যায়, তাহ'লে এই বর্ণনা ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে। এখানেও চিত্রগুপ্তের খাতায় পাপ-পুণ্যের হিসাব এবং পাপ-পুণ্য নির্ণয়ের মানদন্ডকে আমরা অত্যাচারী শাসকের তৈরি সংবিধান এবং অপরাধ ও আচরণবিধির রূপকে দেখতে পারি। সংবিধান শাসকরাই তৈরি করে, আইনকানুনও তাদের তৈরি, বিচারব্যবস্থা তাদের করায়ত্ত, সুতরাং শাস্তি দেবার অধিকার তাদের একচেটিয়া। কিন্তু কৌশলে ত্রৈলোক্যনাথ দেখিয়েছেন যে, বিচারে যমরাজের ও ভুল হয়। পরাধীন দেশের সাহেব-বিচারকদের বিচারেও কি বৈষম্য ও অবিচার থাকত না? মিত্তিরজা, মুহূর্তের সুযোগকে যেভাবে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় কাজে লাগিয়েছে, যেভাবে সে যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে নাস্তানাবুদ করেছে তাকে শাসিতের বা অধীনস্থ প্রজার প্রতিশোধের রূপকে দেখতে পারি। মুহূর্তের সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে যেভাবে মিত্তিরজা যমরাজের খালি-হওয়া সিংহাসন দখল করেছে এবং ক্ষমতায় বসে সব পাপীকে মুক্ত করার আদেশ দিয়েছে তাকে শাসিতের ক্ষমতা দখল এবং এতদিন যারা মুক্তি সংগ্রামে লড়াই করেছে অথচ মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত, তাদেরকে কারামুক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের তাৎপর্যে দেখতে পারি। উপনিবেশের সমাজে সব লেখক সমান সাহসের সঙ্গে শাসকপক্ষের সমালোচনা করতে পারতেন না, নানাবিধ সীমাবদ্ধতা তাঁদের অসহায় ক'রে রাখত, সেই জন্যই ত্রৈলোক্যনাথ প্রাকৃতে-অপ্রাকৃতে মেশানো এমন এক অসঙ্গতিপূর্ণ ফ্যান্টাসির জগত নির্মাণ করেছেন।

বিশিষ্ট সমালোচক শিশিরকুমার দাশ ত্রৈলোক্যনাথের এই ফ্যান্ট্যাসির জগত সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

"ত্রৈলোক্যনাথের গল্পলোকের আকাশ 'আবোল তাবোলে'র আকাশ। Fantasy -র আকাশ। সেখানে প্রশ্ন নেই, অবান্তর জিজ্ঞাসা নেই— সেখানে শুধু গল্প। বৈঠকী রীতির চরম সার্থকতা এইখানে।"[৭]

এবং

"ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যলোকের আকাশ উদ্ভট কল্পনার, কিন্তু ভূমি সামাজিক। তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি, যেমন স্বপ্ন,

ভূতপ্রেতের কথাবার্তা, জীবজন্তুর পরিচয় ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ... তাঁর ব্যঙ্গ দুটি পথ নিয়েছে। কখনও ভূতপ্রেত বা জিবজন্তুর মধ্যে— কখন ও স্বয়ং মানব-চরিত্রের মধ্য দিয়ে।"[৮]নয়নচাঁদের চরিত্রচিত্রনের সার্থকতা প্রসঙ্গে শিশিরবাবু আর বলেছেন—।

নয়নচাঁদ ও ডমরু বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র।.... দুজনেই সুযোগ বুঝে লোক ঠকিয়ে কাজকর্ম করায় ওস্তাদ। নয়নচাঁদের সঙ্গে ভূতের দেখা হয়েছে।.... ভাঁড়ু দত্ত, হীরা বা ঠকচাচা যে শ্রেণীতে বিরাজিত নয়নচাঁদ তাদেরই সমগোত্রীয়।"[৯]

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূত-প্রেত প্রসঙ্গ এবং ভৌতিক ব্যাপারগুলি যে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের উপাদান এবং এইসব

প্রসঙ্গের যে কিছুটা রূপক-তাৎপর্য আছে, তা ধরা পড়েছে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে। তিনি বলেছেন—

"তাঁহার ভূত ঠিক ভূতের মতই ব্যবহার করে, এমনকি মানবের সম্পর্কে আসিলেও উহার ভৌতিক প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয় না। তা ছাড়া, বাঙালীর সাধারণ জীবনযাত্রাও বিশ্বাস-সংস্কারের সহিত এই ভৌতিক আবির্ভাবসমূহের এক সহজ ছন্দের মিল আছে। সময় সময় ইহাদের পিছনে বাঙালী সমাজের কুসংস্কার ও উদ্ভট ভাবকল্পনার বিরুদ্ধে একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গমনোভাবের পরিচয় মিলে। ব্যঙ্গের সূচিমুখে বিদ্ধ হইয়া উদ্ভট কল্পনার বুদবুদ খানিকটা রূপক-তাৎপর্যের অন্তঃসঙ্গতি লাভ করিয়াছে।"[১০]

নয়নচাঁদ ধর্ম নিয়ে লোক-ঠকানো ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। তবুও পাঠক শেষ পর্যন্ত নয়নচাঁদ বা ডমরুর প্রতি বিদ্বেষ পুষে রাখতে পারেন না। বড়জোর তাদের প্রতি একটা সমালোচনাত্মক মনোভাব জাগ্রত রাখতে পারে। কারণ তারা এই সমাজেরই ফসল (product) আর এদের সামনে রেখে ত্রৈলোক্যনাথ তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজকেই ব্যঙ্গ-বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ'প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে আমরা আলোচনার বর্তমান উপসংহার করতে পারি—".... নয়ন বা ডমরুরা কখনো পাঠকের ঘৃণার পাত্র হয় না, ... আর ত্রৈলোক্যনাথ তো ব্যক্তিগতভাবে এদের আক্রমণ করতে চাননি। যে সমাজ ডমরু বা নয়নচাঁদদের সৃষ্টি করে তিনি সেই সমাজকেই ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন।"[১১]

উল্লেখপঞ্জিঃ

১.দ্র. 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ সুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত/ কলকাতা, ১৪১০/ পৃঃ ৬০১
২. তদেব/ পৃষ্ঠাঃ- ৫৮৭
৩. তদেব/ পৃষ্ঠাঃ- ৫৮৮
৪দ্র. তদেব/ পৃঃ ৫৯৪
৫.তদেব/ পৃঃ ৫৯৮
৬. তদেব / পৃঃ ৫৯৯
৭. দ্র. বাংলাছোটগল্পঃ ১৮৭৩-১৯২৩ / কলকাতা, ১৯৮৩/ পৃঃ ১৩৭
৮. তদেব/ পৃঃ ১৩৯
৯. তদেব/ পৃঃ ১৪১
১০. দ্র বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/ সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ/ কলকাতা, ১৯৮৪/ পৃঃ ৩৯৫
১১. দ্র. ত্রৈলোক্যনাথঃ কথাসাহিত্য ভাবনা/ কলকাতা, ২০০৫/ পৃঃ ৫৪

৩.(খ)২.গল্প-বিশ্লেষণঃ 'লুল্লু' (১২৯৮)
['ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থে সংকলিত, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ১৮৯৬]

'লল্লু' গল্পটি 'ভূত ও মানুষ' গল্প সংকলনের তৃতীয় গল্প (উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে মোট চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প আছে)। এই গল্পটি প্রথমে 'জন্মভূমি' পত্রিকায় পৌষ, ১২৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথের অন্যতম জনপ্রিয় গল্প হলো 'লুল্লু'। আগাগোড়া জমাট ভূতের গল্প। ভৌতিক ক্রিয়াকলাপও এই গল্পে প্রচুর। এইসব ভৌতিক কান্ডকারখানার মধ্যে দিয়েই ত্রৈলোক্যনাথ জমিয়ে গল্প বলেছেন, ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মিশ্রণে এক দারুণ উপভোগ্য গল্প হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু প্রথমেই জানানো প্রয়োজন যে, 'লুল্লু' নিছক ভূতের গল্প নয়, ভূতপ্রেতের প্রসঙ্গকে এখানে রূপকের তাৎপর্যে গ্রহণ করা যায়। গল্পটির নিবিড় পাঠ থেকে যে সামগ্রিক সংবেদন তৈরি হয়, তার মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার আদলটি সম্যকরূপে বুঝে নেওয়া যায়। সে-প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব, এখন সর্বাগ্রে কাহিনি-সংক্ষেপের পরিচয়গ্রহণ প্রয়োজন।

কাহিনি-সংক্ষেপঃ

দিল্লি শহরের ঘটনা। জনৈক আমীরসেখ-এর পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে লুল্লু নামে একটি ভূত আকাশপথে কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে গেল, তার আর দিশা পাওয়া গেল না। দোষের মধ্যে, স্ত্রী যখন গভীর রাত্রে একাকিনী ঘরের বাহিরে গিয়েছিলেন, ঘরের মধ্যে থেকে আমীর স্ত্রীকে ভয় দেখাবার জন্য বলেছিলেন 'লে লুল্লু'। ঠিক সেইসময় লুল্লু তাঁর বাড়ির কার্নিশে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। আমীরের কথায় উৎসাহিত হ'য়ে সে ওই অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে মুহূর্তের মধ্যে 'আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তার আর ঠিক নাই'।

কিন্তু লুল্লু-ই যে আমীরের স্ত্রীকে অপহরণ করেছে এই তথ্য জানা গেল অনেক পরে। কান্না থামিয়ে আমীর প্রথমে গিয়েছিলেন এক 'রোজা' তথা গণৎকারের কাছে। তার নাম জান। জান অনেকক্ষণ গণনা ক'রে জানালেন যে, আমীরের স্ত্রীকে ভূতে নিয়ে গেছে। কিন্তু জান যেহেতু ভূতের রোজা নন, তাই তিনি সেই ভূতের সুলুকসন্ধান দিতে পারবেন না। তাই আমীরকে যেতে হলো এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ওই গ্রামে 'ভূতের রোজা' নামে খ্যাতি আছে। কারণ জনৈক মহাজনের কন্যার ঘাড় থেকে সে সম্প্রতি একটি ভূত নামিয়েছে। কিন্তু অকপট স্বীকারোক্তিতে ওই ব্রাহ্মণ জানালো যে, সম্প্রতি একটি ভূত ছাড়ানোয় তার কোনোই কৃতিত্ব ছিল না। সবটাই সাজানো ব্যাপার। ওই গ্রামের এক তাঁতি, যে বিকট সুরে উচ্চকণ্ঠে গান গাইত, মাঠের মাঝখানে সেই কানে তালা-লাগানো গান শুনে সন্ত্রস্ত হ'য়ে জনৈক গাছে-ঝোলা ভূত পরিত্রাণ পাবার জন্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক 'সমঝোতা' করেছিল। চুক্তি অনুযায়ী ভূত জনৈক মহাজন-কন্যার ঘাড়ে চাপে এবং ব্রাহ্মণের রোজাগিরিতে পরে ছেড়ে চলে যায়। ফলে ব্রাহ্মণের প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি হয়, নাম-খ্যাতিও যথেষ্ট পরিমাণে হয়। ব্রাহ্মণ শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মাঠের মধ্যে তাঁতির গান বন্ধ করার ব্যবস্থা সে করবে, ভূতও শান্তিতে মাঠের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছে বিরাজ করতে পারবে। এই বৃত্তান্ত শুনে ওই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে আমীর সেই গাছতলায় গিয়ে ভূতের শরণ নিলেন। সেই ভূতই আমীরকে জানালো যে আমীর-পত্নীকে লুল্লু নামে এক নব্যসভ্যভূত নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর বেশি তথ্য তার পক্ষে জানানো সম্ভব নয়, কারণ সে এখন বৈরাগ্য অবলম্বন করছে। যেতে হবে ঘ্যাঁঘোর কাছে। কারণ- 'ঘ্যাঁঘো সকল সংবাদ রাখিয়া থাকে। ভূতদিগের মধ্যে সে একরূপ গেজেট।'

ঘ্যাঁঘো থাকে কুয়োর ভিতরে। মনের দুঃখে স্বেচ্ছা নির্বাসিত। সম্প্রতি একটু জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে তাব, তাও মনোদুঃখে। দুঃখের কারণ পরে জানা গেছেঃ প্রণয়ভঙ্গ। পরমাসুন্দরী ভূতিনী নাকেশ্বরীকে প্রেম নিবেদন করেছিল, কিন্তু পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান। অগত্যা কূপের মধ্যে নির্বাসন। ঘ্যাঁঘো সহজে কূপের মধ্য থেকে বের হয় না, তাই আবার তার জন্য তাঁতির গানের ব্যবস্থা করা হলো। সে-গান এমন ভয়ানকরকম অশ্রাব্য যে ঘ্যাঁঘোরও প্রাণ বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো। তাই সে হামাগুড়ি দিয়ে কূপ থেকে বেরিয়ে এলো। প্রথমে সে কিছুই বলতে চায় না। পরে তাকে আবার তাঁতির ওই ভয়ঙ্কর গান শোনাবার ভয় দেখিয়ে তাকে সংবাদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত করা হলো। নাগরা জুতো প'রে দেশভ্রমণে বেরিয়ে কিছুক্ষণ পরে ঘ্যাঁঘো সংবাদ নিয়ে এলো। সে জানালো—

"হিমালয়-প্রদেশে ভীমতাল নামক একটি হ্রদ আছে। হ্রদের ভিতর পাহাড়ের গায় লুল্লু একটি ঘর খুদিয়াছে। জলে ডুব দিয়া তবে সে ঘরের ভিতর যাইতে পারা যায়, অন্য পথ নাই। তাহার ভিতর লুল্লু আমীরের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।"[১]

তবে সেখানে প্রবেশ করা মনুষ্যের পক্ষে খুব সহজসাধ্য নয়। একটি হৃষ্টপুষ্ট ভূতকে বেছে নিয়ে তার অঙ্গ থেকে তেল নিষ্কাশন ক'রে সেই তেল মেখে ভীমতাল হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়।

অতঃপর আমীর গেলেন গোঁগোঁ ভূতের কাছে। গোঁগোঁ 'গলায়-দড়ি ভূত' নামে পরিচিত, মানুষকে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করে। তাই এমন নাম! নিকটস্থ গাছেই তার আবাস। গোঁগোঁ আবার ঘ্যাঁঘো-র পরম শত্রু। কারণ যেখানেই ঘ্যাঁঘোর বিয়ে ঠিক হয়, গোঁগোঁ সেখানে গিয়ে ভাঙচি দিয়ে আসে। তাই ঘ্যাঁঘোর পরামর্শমতো আমীর ওই গাছে গেলেন এবং গলায়-দড়ি ভূতকে ফাঁদে ফেলে, ভয় দেখিয়ে, বশীভূত ক'রে একটি চণ্ডুর নলের মধ্যে তার হ্রাসপ্রাপ্ত কলেবরকে বন্দী ক'রে কলুর কাছে গেলেন। কলুর তৎপরতায় ভূতকে ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করিয়ে এক শিশি ভূতের তেল প্রস্তুত করা হলো। সেই তেল সর্বাঙ্গে মেখে প্রভূত দৈহিক বল অর্জন ক'রে ভীমতাল হ্রদের অভ্যন্তরস্থ শুষ্ক কক্ষে আমীর প্রবেশ করলেন। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। জানালেন যে লুল্লু তাঁর স্ত্রীকে বন্দী ক'রে রেখেছে বটে, কিন্তু অসম্মান করেনি। কেবল বিধিসম্মত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে কাজী ডেকে আনার কথা বলে। আমীর-পত্নী এক বৎসর সময় চেয়েছে মনস্থির করার জন্য। এরপর আমীরের বুদ্ধিতে তার স্ত্রী কৌশলে লুল্লুকে আফিমের নেশা ধরালেন। এই নেশায় সে যখন বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে তখনই লুল্লুকে জানানো হলো যে আফিম আর নেই। নেশাগ্রস্ত লোক নেশার বস্তু হাতের কাছে না পেলে যেমন হয়, লুল্লুও তেমনি দ্রুত অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। শক্তিহীন, বলহীন হ'য়ে সারাদিন শুয়েই থাকে। রাত্রে আর চরতেও বের হয় না। সেই সুযোগে গুপ্ত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে আমীর তার স্ত্রীকে উদ্ধার ক'রে দিল্লির বাসগৃহে ফিরে এলেন। নেশাগ্রস্ত লুল্লু তার বশ্যতা স্বীকার ক'রে আজীবন আমীরের ভূতগিরি করতে সম্মত হলো। লুল্লুর পিঠে চেপেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বগৃহে ফিরে এলেন। ফিরে এসে প্রথমে আমীরের পুরনো প্রাসাদ উদ্ধার হলো, আমীর মহা সমারোহে ঘ্যাঁঘোর সঙ্গে নাকেশ্বরীর বিয়ে দিলেন, সবই লুল্লুর সহযোগিতায়। বিয়েতে প্রচুর সুখাদ্য পরিবেশিত হলো, তাঁতি এসে মহা আনন্দে গান জুড়ে দিল, সবাই কানে তুলো দিয়ে 'বাহবা বাহবা' বলল। লুল্লুও মহা আনন্দে আমীরের অনুগত হ'য়ে থেকে গেল, তাকে দু'টি সোনার পাখনা গড়িয়ে দিলেন আমীর-পত্নী। লুল্লুর পিঠে সওয়ার হ'য়ে তাঁরা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ক'রে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

গল্পের দর্পণে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার স্বরূপঃ

'লুল্লু' গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে জমজমাট ভূতের গল্প বলে মনে হলেও, উপভোগ্যতা সমান মাত্রায় বজায় রেখেও এর অন্তর্নিহিত সমাজ-পর্যবেক্ষণের সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এই গল্পে ত্রৈলোক্যনাথ ভূতেদের যে সমাজ, যে শ্রেণীবিন্যাস এবং যেসব কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন, তার মধ্য থেকে আজগুবী অংশটুকু বাদ দিলে বাকি সবটাই আমরা মানুষের সমাজের রূপক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। কখনো প্রান্তিক অন্তেবাসী মানবসমাজের রূপক-প্রতিনিধিরূপে কখনো বা ইংরেজিশিক্ষিত সভ্য নব্য ভূতরূপে, কখনো সংবাদপত্রের সম্পাদক রূপে এইসব ভূত দেখা দিয়েছে। উপনিবেশের সমাজে, প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে মানুষ তো বটেই, ভূতেদেরও দুর্দশার শেষ নেই। ভূতেদের সমাজে 'ভূতগিরি' একটি পেশা। মানুষ মরলে তার 'ভূতগিরি' করার পেশায় অপেক্ষমান ভূতেরা নিযুক্ত হয়। এজন্য তাদের দরখাস্ত করতে হয়, দরখাস্ত করে অপেক্ষমান পর্যায়ে থাকতে হয় কখন চাকরি জোটে। অর্থাৎ ভূতেদের সমাজেও বেকার সমস্যা। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সমকালের মানব সমাজে যে বেকার সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই-ই ভূতেদের সমাজে আরোপ করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, চাকুরীগত প্রতিষ্ঠার জন্য ত্রৈলোক্যনাথকেও ব্যক্তিজীবনে কঠোর জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছিল। তিনিও অনেকদিন বেকার ছিলেন। এদিকে, ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষার সুবাদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের ফলে শিক্ষিত সমাজে ভূতপ্রেত বা ভূতে-ধরা সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার নানা প্রশ্নের ও সংশয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। এখন আর শিক্ষিত সমাজ মানতেই চায় না যে কাউকে ভূতে ধরেছে। বলা হয়ঃ ভূত নয়, আসলে হিস্টিরিয়া! দ্বিতীয় অধ্যায়ে ('রোজা') এ'ব্যাপারে রোজা-র আক্ষেপ ফুটে উঠেছে—

"এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলা এমনই ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কিনা হিস্টিরিয়া হইয়াছে। একথায় রক্তমাংসের শরীরে রাগ হয়, ভূতদেহে ত'রাগ হইবেই।"[২]

নারী অপহরণ সেকালের সমাজে খুব ব্যাপক আকারে না হলেও, অন্যতম সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছিল। আমীর-পত্নীকে লুল্লুর হঠাৎ উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে দুর্গম স্থানে বন্দী ক'রে রাখার ঘটনাকে আমরা অপহরণের তাৎপর্যে দেখতে পারি। বণিক-পত্নীর অসামান্য রূপই যে লুল্লুকে এহেন অপকর্মে প্রণোদিত করেছে, অর্থাৎ আসক্তিই এক্ষেত্রে মূল নিয়ন্ত্রক, তার ইঙ্গিত লেখক প্রথমেই দিয়েছেন—

"চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী নারী।.... এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন।"[৩]

লুল্লু সভ্যভব্য ভূত, তাই বণিক-পত্নীর কোনোরকম অসম্মান করেনি, বলপ্রয়োগ করেনি। সেকালের নব্যবঙ্গীয় সমাজের বহুনারী-আসক্তি এমনকি বেশ্যাসক্তির কথাও সর্বজনবিদিত। নাটকে-প্রহসনে-নকশায় সর্বত্র এই আসক্তির ছবি পাওয়া যায়। হয়তো ব্যাপক হারে নারী অপহরণ ঘটত না, কিন্তু এহেন দুষ্কর্ম হয়তো তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সেকালের সংবাদপত্রে এইরকম দু'একটা বিক্ষিপ্ত সংবাদ নিশ্চয়ই দুর্লভ হবে না! লুল্লুর এই অপকর্মকে ত্রৈলোক্যনাথের সমকালের সামাজিক সমস্যার রূপক-প্রতিফলন হিসেবে সহজেই দেখা যেতে পারে।

ঊনিশ শতকের কলকাতার নব্যবঙ্গ সমাজের আচরণগত বিকার,যার চমৎকার সাহিত্যিক প্রতিফলন দেখা যায় এ'কেই কি বলে সভ্যতা'(মধুসূদন দত্ত) বা 'সধবার একাদশী' (দীনবন্ধু মিত্র) নাটকে, তার কিছু উল্লেখ 'লুল্লু' গল্পেও পাই। শুধু মনে রাখতে হবে, 'লুল্লু' গল্পটির কেন্দ্রীয় পটভূমি দিল্লি শহর, কিন্তু সেখানে যা যা ঘটে, তা সবই যেন বঙ্গদেশীয় সমাজ ও লোকসংস্কারের অনুকূল। গল্পের তৃতীয় অধ্যায়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজের সহজসরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের টেবিল-চেয়ার-কাঁটা চামচে খাওয়ার অনুকরণ-স্বভাবকে খোঁচা দিয়ে বলেছে—

"আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজকালের ইংরেজী পড়া বাবুভায়াদিগের মত নাই।"[৪]

গাছ থেকে নেমে-আসা ভূত, যে বর্তমানে বৈরাগ্য ধর্মগ্রহণ করেছে, ভূতেদের সমাজে সে একদা প্রবল পরাক্রমশালী ছিল। কাউকে সে ভয় পায় না, ব্রাহ্মনকে তো একেবারেই ভয় পায় না। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুদের তার খুব ভয়। কারণ তারা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপ যদি গায়ে বমি ক'রে দেয়! সে বলেছে—

> "আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী-পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি। ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি, কেন না, এটা-সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচকা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্ত্ত্যলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাকবিশিষ্ট নয়।"[৫]

এখানে লেখকের ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কটাক্ষ বেশ প্রকট।

আমাদের দেশে সংগঠিতভাবে বিদেশীবস্ত্র তথা অন্যান্য পণ্য বয়কটের আন্দোলন দেখা দিয়েছিল মূলতঃ ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ -বিরোধী আন্দোলনের সময়। তবে, ভারতীয় জনসমাজে, বিশেষতঃ বণিক ও স্বদেশী রাজনীতিকদের মধ্যে বিদেশী পণ্য-বিরোধী মনোভাব যে জাগরুক ছিল, তার প্রমাণ আছে 'লুল্লু' গল্পে। 'লুল্লু' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯১ (১২৯৮) সালে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলনের প্রায় দেড়দশক আগেই বিদেশী পণ্য সম্পর্কে বঙ্গসমাজের ক্ষোভ ত্রৈলোক্যনাথ এইভাবে ভূতের মুখে বলিয়েছেন—

"দেশীয় সংবাদপত্রসকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মন চিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একেবারে নির্দ্ধন হইয়া যাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়েরা ধন লুটিতেছে। ভাল, কাপড় না পরিলেই ত হয়? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে ত' আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না।"[৬]

ভূত আরও বলেছে—

"রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই ত'হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে।"[৭]

অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বৃটিশ যে রেল-পরিবহন এদেশে প্রচলন করেছিল, তার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভূতের তথা তার স্রষ্টার আপত্তি নেই। আপত্তি , রেলের মতো গণপরিবহনের বিকল্প একটি ব্যবস্থা না ক'রে তার বাণিজ্যিক মুনাফা নিয়ে যারা সমালোচনায় মুখর হ'য়ে উঠেছে, তাদের সম্পর্কে। সুতরাং রেল সম্পর্কে ভূতের যে কটাক্ষ বা ব্যঙ্গের খোঁচা,তাকে এই তাৎপর্যে দেখতে হবে। কিন্তু দেশীয় বাজারে বিদেশী বস্ত্রের ব্যাপক বিক্রি ও তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বদেশী বস্ত্র-বণিকদের পশ্চাদাপসরণের ঘটনা ত্রৈলোক্যনাথের সমর্থন পায়নি। ভূতের মুখে 'কাপড় না পরিলেই ত হয়' নিছকই ব্যঙ্গোক্তি।

'লুল্লু' গল্পের ষষ্ঠ অধ্যায়টি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই অধ্যায়েই কলুর ঘানি থেকে 'ভূতের তেল' নিষ্কাশনের মজাদার বর্ণনা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে যে বর্ণনা অত্যন্ত আজগুবী ও কৌতুককর বলে মনে হয়, সেই বর্ণনাকেই আমরা ধনী অভিজাতদের দ্বারা (আমীর চরিত্রটি যাদের প্রতিনিধি) সমাজের প্রান্তিক মানুষ তথা অন্তেবাসী মানুষদের নির্মম সামাজিক পীড়নের রূপক হিসেবে দেখতে পারি। গলায়-দড়ি ভূতকে সংবাদপত্রের এডিটর হবার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল, অথচ সে লেখাপড়া জানে না। প্রলুব্ধ হয়েই সে আমীরের আফিমের কৌটার মধ্যে বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। তখনও সে জানত না তাকে পিষে তেল বের করাই আমীরের উদ্দেশ্য। তারপর তার অভিজ্ঞতা রীতিমত করুণ—

"আমীর নল হইতে ভূতটিকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ

ঘানি চালাইয়া দিলেন। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল। ভূতের হাড় মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। ভূত,— "ত্রাহি মধুসূদন। ত্রাহি মধুসূদন।" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। .....ঘানি হইতে ক্রমে টপ্‌টপ্‌ করিয়া তেল পড়িতে লাগিল।...যখন ভূতের দেহ একেবারে তেলশূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোনকালে মরিয়া যাইতে।"[৮]

আমরা এই বর্ণনাকে ধণিক-কর্তৃক শ্রমজীবী মানুষের শ্রম-নিষ্পেষণ বা শোষণের রূপক হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। একে সামাজিক নিষ্পেষণের রূপক হিসেবেও গ্রহণ করা চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এইভাবে যে তেল নিষ্কাশিত হলো, সেই 'ভূতের তেল' গায়ে মেখেই আমীর অধিক বলশালী হলেন এবং ভীমতাল হ্রদের অভ্যন্তরস্থ কক্ষে বন্দিনী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে সমর্থ হলেন। চিরকালই ধনী সম্পদশালী অভিজাত শ্রেণী এইভাবে প্রান্তিক মানুষদের নিষ্পেষণ ক'বে, তাদের বলে বলীয়ান হ'য়ে কার্যোদ্ধার ক'রে এসেছে। অধিক শ্রমসাধ্য কাজ চিরকালই সমাজের অন্তেবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট হ'য়েএসেছে। সুতরাং 'ভূতের তেল' অধ্যায়ে ত্রৈলোক্যনাথ রূপকের আশ্রয়ে আমাদের সমাজের সেই চিরকাল প্রবাহিত শ্রেণী-বৈষম্য তথা শ্রেণী-নিষ্পেষণের চিত্র অঙ্কন ক'রে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। উদ্ধৃত বর্ণনার একদম শেষে 'ছোবড়ারূপ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, অংশটি প্রণিধানযোগ্য। এভাবেই শ্রমজীবী শ্রেণীর শ্রমদানের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হবার পর তাদের 'ছোবড়া' করেই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয় ধনিক শ্রেণী।

ত্রৈলোক্যনাথের সমকালীন দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সেকালের সংবাদপত্রগুলি, পরাধীন দেশে তাদের পবিত্র কর্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে, মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে, এইসব সংবাদপত্রগুলি শুধুই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির সংবাদ পরিবেশন এবং বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে গালি দেবার প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। সেকালের বিখ্যাত ব্যঙ্গ-কবিতায় বা প্রহসনে এর বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায়। 'লুল্লু' গল্পেও এই সমাজ-বাস্তবতার উল্লেখ আছে। যদিও এর পটভূমি দিল্লি শহর, তবু এই গল্পে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই বঙ্গীয় সমাজবাস্তবতার বিভিন্ন অনুষঙ্গ কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'লুল্লু' গল্পের একাধিক স্থানে স্বদেশী সংবাদপত্রের এই স্বধর্মচ্যুতি এবং বিকারগ্রস্ততার প্রতি কটাক্ষপাত আছে। গলায়-দড়ি ভূতকে কৌটা-বন্দী করার সময় আমীর তাকে লোভ দেখিয়েছিলেন যে তাকে তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদক করবেন। সহকারী সম্পাদকতা করবার জন্য ইতিমধ্যেই একটি ভূত তিনি পাকড়াও করেছেন, যদিও আমীরের এই বিবৃতি সর্বৈব মিথ্যা। সে যাই হোক, ভূত যখন জানালো যে সে লেখাপড়া আদৌ জানে না তখন আমীর বললেন সংবাদপত্রের এডিটরি করার জন্য লেখাপড়া জানার আদৌ প্রয়োজন নেই। সমকালীন সংবাদপত্রের আবর্জনা ঘাঁটার ভূমিকা দেখে ত্রৈলোক্যনাথ কতখানি তিতিবিরক্ত হয়েছিলেন, সম্পাদকদের ঘুরিয়ে মূর্খ বলার মধ্যেই তার প্রমাণ নিহিত আছে। এবার গোঁগোঁ ভূতের সঙ্গে আমীরের কথোপকথন লক্ষ্য করা যাক—

"আমীর বলিলেন—"আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন।... তোরে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।" গোঁগোঁ বলিল, —" আমি যে লেখা-পড়া জানিনা।" আমীর বলিলেন, "পাগল আর কি! লেখা-পড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস ত?" গোঁগোঁ বলিল,— "ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" আমীর বলিলেন,— "তবে আর কি! আবার চাই কি? এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা-কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্য্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।"[৯]

এই কথোপকথন থেকে তিনটি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে—

১) গল্পরচনার সমকালে সংবাদপত্রের সম্পাদকতা আর মানুষের পক্ষে সম্মাননীয় পেশা নয়, তাই ভূত প্রয়োজন।

২) লেখাপড়া না জানলেও স্বচ্ছন্দে সম্পাদকতা করা চলে। অর্থাৎ লেখকের সমকালীন অধিকাংশ সংবাদপত্র অশিক্ষিত বা মূর্খদের দ্বারা পরিচালিত।

৩) সংবাদ পরিবেশন নয়, জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন নয়, শুধুমাত্র গালি দেওয়াই সেকালের সংবাদপত্রের একমাত্র কাজ ছিল। মনুষ্য, সমাজে প্রচলিত যাবতীয় গালি নিঃশেষিত, তাই এখন ভূতের গালি প্রয়োজন। আর, এই গালি বিক্রয় করেই সেকালের সংবাদপত্র মালিকদের প্রভূত মুনাফা অর্জন হত।

অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে আমীর যেভাবে কৌশলে লুল্লুকে আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন করেছেন এবং সেই নেশায় তাকে দুর্বল ক'রে দেবার পর হাতের কাছে আফিম না জুগিয়ে তাকে চিরকালের মতো পদানত ক'রে ফেলেছেন তাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অনেক পরে 'চীনে মারণের ব্যবসায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সমগ্র চীনা জাতিকে ইউরোপ আফিম দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল , তা সবিস্তারে দেখিয়েছেন। 'লুল্লু গল্পে আফিম-সংক্রান্ত বর্ণনাটি রূপকথার আদলে (বন্দিনীকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে শত্রুকে কাবু করা) পরিবেশিত হ'য়ে মজা বাড়িয়ে তুললেও এর অন্তর্নিহিত সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমে নিষ্পেষণ ক'রে 'ভূতের তেল' বের করা এবং পরে আফিমের নেশা ধরিয়ে লুল্লুকে

চিরকালের মতো দাসানুদাসে পরিণত করা— এই দু'টি ঘটনা ত্রৈলোক্যনাথের গভীর সমাজবীক্ষার ফলশ্রুতি। এইভাবেই তো সমাজের প্রভাবশালী ক্ষমতাবান শ্রেণী নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য নিম্নশ্রেণীর মানুষকে পেষণ ক'রে এসেছে, তাদের নেশাচ্ছন্ন ক'রে রেখে কাজ হাসিল করেছে।

সবশেষে বলা দরকার লুল্লুর সাবান মাখার ঘটনার তাৎপর্যের কথা। লুল্লু সভ্যনব্য ভব্য ভূত। শহুরে ভূত, সম্ভবতঃ ইঙ্গবঙ্গ সমাজ থেকে তার আগমন, তাই সে সাহেবী কায়দায় সাবান মাখতে শিখেছে। উপনিবেশের সমাজে সাহেব-ঘেঁষা বাঙালির দল, বিশেষতঃ কালো চামড়া ও বাদামী চামড়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় পোশাকে -আশাকে আদব-কায়দায় কেতাদুরস্ত সাহেব হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু গাত্রবর্ণ কোথায় লুকোবে? সে যে কিছুতেই সাহেবদের মতো হয় না! অতএব, সাবান মাখার বিধান। সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে যদি গায়ের চামড়ার রঙ কিছুটা অন্ততঃ সাহেবদের কাছাকাছি করা যায়! লুল্লুও এই হীনমন্যতাজনিত ঔপনিবেশিক মানসিকতার শিকার, অনুকরণ-প্রবণতার বিশ্বস্ত সৈনিক। আমীর-পত্নীকে লুল্লু বলেছে—

"গতবার আসিয়া বলিল,— 'দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফর্‌সা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব, সকলে বলিবে, 'এ লুল্লু নয়, এ সাহেব-ভূত; কোন লর্ডের ছেলে হইবে। তখন তুমি আর আমাকে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না"।[১০]

এখানে লুল্লুর কালো রঙের জন্য হীনম্মন্যতা খুব স্পষ্ট যা সাধারণভাবে উপনিবেশের সমাজের সাধারণ মনোভাবের (general attitude) প্রতিফলন!

'লুল্লু' গল্পে নিহিত ব্যঙ্গ সম্পর্কে সমালোচক শিশিরকুমার দাশ বলেছেন—

"ত্রৈলোক্যনাথের ভূতপ্রেত, স্বপ্ন ইত্যাদি অবাস্তব ব্যাপারগুলিও তাঁর ব্যঙ্গের পথ।.... লুল্লুর মধ্যে গোঁগোঁ ভূতটির মধ্যে তৎকালীন সংবাদপত্রের নিম্নমান ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কথাবার্তার মধ্যে যে নোংরামি থাকত তাকে ব্যঙ্গ করেছেন।"[১১]

প্রবীণবয়সে ত্রৈলোক্যনাথের কাছে একবার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এসেছিল। 'কালাপানি পাড়ি' দিতে হবে বলে তাঁর সংস্কারান্ধ আত্মীয় স্বজন এব্যাপারে তাঁকে নিষেধ করেছিল। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তিনি বিদেশ গিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। সেই অপমানের স্মৃতি তাঁর চিত্তে জাগ্রত অবস্থায় ছিল। 'লুল্লু' গল্পে তারও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। লুল্লু বলেছে—

"আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকূল- ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা।.... পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন, কি ভূত হউন, নর হউন কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন।"[১২]

এখানে হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি লেখকের তীব্র বিদ্রূপ ভূতের মুখে ব্যক্ত হয়েছে।

'লুল্লু' গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে জমাট ভূতের গল্প হলেও এর সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য অসাধারণ। এ'গল্পের প্রতিটি অধ্যায়ে ত্রৈলোক্যনাথের গভীর সমাজবীক্ষা লগ্ন হ'য়ে আছে, গল্পের অপরিহার্য শিল্পমূল্য হিসেবে।□

উল্লেখপঞ্জিঃ

১.দ্র.'লুল্লু'/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ সুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত/ পৃঃ ১৯-২০
২. তদেব/ পৃঃ ১২
৩. তদেব / পৃঃ ৯
৪. তদেব/ পৃঃ ১৩
৫. তদেব/ পৃঃ১৬
৬. তদেব/ পৃঃ ১৭
৭. তদেব/ পৃঃ ১৭
৮. তদেব/ পৃঃ ২২-২৩
৯. দ্র. তদেব/ পৃঃ ২১-২২
১০. তদেব/ পৃঃ ২৬
১১. দ্র. বাংলা ছোটগল্পঃ ১৮৭৩-১৯২৩/ কলকাতা, ১৯৮৩/ পৃঃ ১৩৯
১২. দ্র.১০-এর অনুরূপ/ পৃঃ ৩২

৩. (খ) ৩. গল্প-বিশ্লেষণ ঃ'স্বদেশী কোম্পানী' (১৯২৩)
['ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থে সংকলিত। গ্রন্থটির প্রকাশকাল— আগস্ট, ১৯২৩]

ত্রৈলোক্যনাথের শেষ গল্পগ্রন্থ 'ডমরুচরিত' তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। তার আগে সাতটি গল্পের সংকলিত গল্পমালা হিসেবে 'ডমরুচরিত' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার পরপর সাতটি পূজা সংখ্যায়। এদের মধ্যে 'স্বদেশী কোম্পানী'গল্পটি 'ডমরুচরিত' গল্পমালার পঞ্চম গল্প।

ডমরুধর শুধু ত্রৈলোক্যনাথেরই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ধারায় কমিক ভিলেন হিসেবে ডমরু অতুলনীয় চরিত্র— ভাঁড়ু দত্ত বা ঠকচাচার চেয়েও তাকে অধিক উজ্জ্বল বলে মনে হয় মাঝে মাঝে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ডমরুধর সম্ভবতঃ ত্রৈলোক্যনাথের Model Hero, তার বৈঠকী গল্পের মধ্য দিয়েই ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সমকালের ভোগবাদী, কুসংস্কারগ্রস্ত, ধর্মভীরু, স্বার্থান্ধ, অর্থলিপ্সু, আচারসর্বস্ব পশ্চাৎপর সমাজকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চিত অর্থ কোনোক্রমেই খরচ না করা ডমরুধরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তার অসামান্য কুকীর্তি বা অপকর্মগুলিই বর্ণিত হয়েছে এই সিরিজের সাতটি গল্পে। 'স্বদেশী কোম্পানী' তার মধ্যে বিশিষ্টতম, ত্রৈলোক্যনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। শুধু তাই নয়, শেয়ার-ভিত্তিক কোম্পানী খুলে ব্যবসার নামে প্রতারণার যে অসাধু প্রবণতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি বণিক সমাজে দেখা দিয়েছিল, তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন হলো এই গল্পটি। ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক উত্তরসূরি পরশুরাম 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে ধর্মব্যবসার যে গল্পটি লিখেছিলেন, তাও এই একই বাস্তবতার প্রতিফলন। একই আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চাপ ও তার প্রতিক্রিয়াজাত শিল্পীবিবেকের তাগিদ এই দু'জন ব্যঙ্গ-শিল্পীকে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের দু'টি অসাধারণ গল্প লিখিয়ে নিয়েছে। 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পের সমাজবীক্ষার আলোচনায় প্রবেশের আগে গল্পটির কাহিনি-সংক্ষেপ জানা প্রয়োজন।

কাহিনি-সংক্ষেপঃ

আলোচ্য গল্পটির মূল বিষয় স্বদেশীয়ানার জোয়ারে লোক-ঠকানো ব্যবসাবুদ্ধির মিশ্রণ ঘটিয়ে হাস্যরসের অবতারণা। গল্পের নায়ক ডমরুধর 'স্বদেশী কোম্পানী'খুলে সহজ লাভজনক পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জনে উৎসুক। "স্বদেশী কোম্পানী" আসলে লোক ঠকানোর গল্প। ইতিমধ্যে একটি স্বদেশী কোম্পানী খুলে ডমরুধর লোক ঠকিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। প্রথম গল্পের সপ্তম পরিচ্ছেদে ডমরুধরের বক্তব্যে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়— "আমার সৌভাগ্যক্রমে এই সময় স্বদেশী হিড়িকটি পড়িল। আমি এক কোম্পানী খুলিলাম। পূর্বদেশের এক ছোকরাকে চারিদিকে বক্তৃতা করিতে পাঠাইলাম। তাহার বক্তৃতার ধমকে শত শত গরীব কেরানী স্ত্রীর গহনা বেচিয়া শেয়ার কিনিল; শত শত দীনদরিদ্র লোকও ঘটি-বাটি বেচিয়া আমার নিকট টাকা পাঠাইল।"[১] শেষে লম্বোদরের ভাষায়— "দেশসুদ্ধ লোক এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে।"[২] পঞ্চম গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে ডমরুধর, শংকর ঘোষকে সঙ্গী ক'রে "গ্রান্ড স্বদেশী কোম্পানী লিমিটিড' নামে কোম্পানী খুলল। সেখানে বড়লোক ও পেশাদারী বক্তাকে ডিরেক্টর ক'রে ইংরেজি ও বাংলায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বলা হলো— কোম্পানি এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ তৈরি ক'রে বাজারে ছাড়বে। এই ধারণাটা ডমরুধর পেয়েছিল শংকর ঘোষের কাছে। আরও বলা হলোঃ ১০০ টাকার শেয়ার হোল্ডারদের ২৫ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হবে। প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে মানুষ কত্তা নির্বোধ হ'য়ে ওঠে দেশবাসীর কথায় তা স্পষ্ট— 'সকলে বলিতে লাগিল যে , আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটী হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতার বাঙালীরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।"[৩]

এঁটেল মাটি দিয়ে যে কাগজ তৈরি করা যায় না, এই সাধারণ বুদ্ধিটুকুও সেকালের দেশবাসীর ছিল না। একজন বলল —"এটেল মাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়িমাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।"[৪] এঁটেল মাটি দিয়ে যে কাগজ তৈরি করা যায় না একথা নির্বোধ শেয়ার হোল্ডারদেরও অজানা ছিল— "প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড় হুড় করিয়া টাকা আসিতে লাগিল। আমি কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। টাকা সব আমার কাছে আসিতে লাগিল।"[৫] ডমরুধর এই নির্বুদ্ধিতাই কাজে লাগিয়েছে। কয়েকমাস হ'য়ে গেল, শংকর ঘোষ এঁটেল মাটি দিয়ে একখানি কাগজও তৈরি করে দেখাতে পারলেন না, কোনো উৎপাদন হলো না । মাসে যে ২৫ টাকা লভ্যাংশ দেবার কথা ছিল,শেয়ার হোল্ডাররা তার একটি টাকাও পেল না। এমনকি বিনিয়োগের আসল টাকাও দেওয়া হলো না। কোম্পানী 'লিমিটেড' ছিল— লাভ তো দূরের কথা, হিসেবের বানানো খাতায় লোকসান দেখানো হলো—

সবটাই শংকর ঘোষের কারসাজি। ডমরুধরের 'গ্র্যান্ড স্বদেশী কোম্পানি লিমিটেড" আগাগোড়া এইরকম লোক-ঠকানো ব্যবসা। শেষপর্যন্ত কোম্পানী লাটে উঠল, শেয়ার হোল্ডারদের টাকা হজম হ'য়ে গেল। এমনকি শংকর ঘোষও কোম্পানির একটি টাকাও পেল না। সবটাই ধূর্ত কৌশলে ডমরুধর আত্মসাৎ করল। অথচ পুরো আইডিয়াটাই শংকরের। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে স্বদেশীয়ানার জোয়ারে একদল ঠকবাজ বা ইতর ব্যবসায়ী কত হীন উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে, ডমরুধরের এই এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ তৈরির লোক-ঠকানো ব্যবসা তারই প্রমাণ।

গল্পের দর্পণে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার স্বরূপঃ

ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী, স্থূল বাণিজ্যবুদ্ধি সম্পন্ন, প্রতারণা-নির্ভর সমাজকে বেড়ে উঠতে দেখেছিলেন। যে আর্থসামাজিক বাস্তবতার তাগিদে ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছিলেন 'স্বদেশী কোম্পানী'র মতো গল্প। যা বাংলা হাসির গল্পের ধারায় এক অসামান্য সংযোজন এবং যা শুধুমাত্র হাসির গল্পের শাস্ত্রীয় পরিধিতে সীমাবদ্ধ না থেকে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার এক অসামান্য দর্পণ হ'য়ে উঠেছে— হ'য়ে উঠেছে যুদ্ধকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের হঠাৎ বড়লোক হবার পিচ্ছিল বাসনার সামাজিক দলিল।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবন-পরিক্রমা ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট ঐক্যসূত্রে গাঁথা— তা হলো সমাজ তথা মানুষের কল্যাণসাধন। আমাদের বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনের সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসন, আমাদের নৈতিক জীবনচর্যা, পারিবারিক বন্ধন, প্রবাহিত জীবনধারার সৌন্দর্য-সুষমা, সত্য ও আদর্শবোধের প্রতি তাঁর ছিল অবিচলিত গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর ঘোরতর অপছন্দ ছিল যা কিছু অসত্য, অসুন্দর, যা কিছু কৃত্রিম ও ছদ্মবেশী, যা কিছু অন্যায় ভন্ডামি ও জনস্বার্থবিরোধী। যেহেতু সেগুলি এই অশ্রদ্ধেয় বিষয়গুলি একান্তভাবে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তির জীবনাচরণের অন্তর্গত, তাই এইসব অপছন্দের বিষয় জানাবার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রকে তিনি সরাসরি আক্রমণ করেননি। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে ও তার সামান্য পরবর্তীকালে আমাদের সমাজে যে ফাটকাবাজি, কালোবাজারি এবং লোক-ঠকানো ব্যবসা শুরু হয়েছিল, সেই ব্যবসা, সেই অসাধুতা, সেই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা এবং তার নিয়ন্ত্রক ও পরিকল্পক কুচক্রী মানুষগুলি (অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহ) ছিল ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। হাসির হালকা আবরণের মাধ্যমেই, অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূত (প্রেতের রূপক-আশ্রয়ে ও রূপকথার আদলে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গভীর সমাজ পর্যবেক্ষণকে হাজির করেছেন, এর সাহায্যেই তিনি সমাজ ও পরিবার-জীবনের গভীর সত্যগুলি উচ্চারণের প্রয়াস পেয়েছেন।

'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পটি প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই রচিত। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে ও তার সামান্য পরে দেশের সর্বত্রই স্বদেশীয়ানার জোয়ার এসেছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে বলতে হয়, ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সময় থেকেই বিদেশী পণ্য বয়কট ও সেই সূত্রে স্বদেশী শিল্প-প্রয়াসের জোয়ার এসেছিল। এরমধ্যে দেশপ্রেমের তাৎক্ষণিক আবেগ অবশ্যই ছিল, কিন্তু ঘোলা জলে মাছ ধরার মতো কিছু সুযোগসন্ধানীও ছিল। এই কপট, ভন্ড, শয়তান ধরনের সুযোগসন্ধানীরাই বাঙালির যাবতীয় স্বদেশী শিল্পোদ্যোগকে কলুষিত ক'রে রেখেছে। ডমরুধর বা নয়নচাঁদ এদেরই প্রতিনিধি। লোক-ঠকানো ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন এবং তার সুবাদে রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে যাওয়া, ইতর ধরনের নির্লজ্জতায় নিরীহ মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা করা এবং তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হ'য়ে গর্বিত বোধ ক'রে স্মৃতিচর্বণ করা— বাস্তবের এই কদাকার নিষ্ঠুর দিকই এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ শুধুমাত্র সামাজিক অসঙ্গতি বা সমস্যার উপস্থাপনেই তৃপ্ত থাকেননি, এ'সম্পর্কে তাঁর একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তথা মাঙ্গলিক চেতনাও উপহার দিয়েছেন। গল্পের মধ্যে প্রতিভাত বাস্তবতার বিপরীত সত্য হিসেবেই তা অনুভব করা যায়। এককথায় বলা যায় যে, ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার তীব্র বর্ণছটা ও প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি এই গল্পে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে শেয়ার মার্কেট ও লিমিটেড কোম্পানীর অন্তর্নিহিত প্রতারণার সম্ভাবনাটি ত্রৈলোক্যনাথ সচেতন পাঠককে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। ব্যঙ্গাত্মক ও আক্রমণাত্মক উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই ত্রৈলোক্যনাথ এই কৃষ্ণবর্ণ বাস্তবকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। বৃটিশ আমলে, পরাধীন ভারতবর্ষে শেয়ার বাজারের ফাটকাবাজি (ব্যবসা শুরু করার প্রারম্ভিক লগ্নির পুরো টাকাটাই, এক পয়সাও পকেট থেকে খরচ না ক'রে যে-কেউ শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে তুলে নিতে পারে) বা লোক-ঠকানো ব্যবসার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী লেখনী এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ঝলসে উঠেছে। গল্পটির নিবিড় পাঠ গ্রহণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, এই গল্পের কাহিনি ও চরিত্র উভয় দিকেই তিনি প্রযত্ন নিয়েছেন সমকালের অর্থলোলুপ ব্যক্তি তথা সমাজের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার জন্য। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ'প্রসঙ্গে বলেছেন— "ডমরুধর পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়াসক্তি ও ঘোরতর নীচে স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তাহার সপ্রতিভতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আপনার সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচ সত্যভাষণের জন্য সে আমাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় না।"[৬]

ডমরুধর ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। কলিকাতার দক্ষিণে একটি গ্রামে ডমরুধরের বাস। প্রথম জীবনের নিতান্ত দরিদ্র ছিল। হর ঘোষের দোকানে কাজ করার সময় শিখেছিল — "টাকা উপার্জন করিলেই টাকা থাকে না, টাকা খরচ না করিলেই

টাকা থাকে।" অনেক কৌশল ক'রে একটি পয়সাও খরচ না ক'রে তিনি এখন প্রভূত ধনশালী। ডমরুধর প্রতিবছর দুর্গাপূজা করেন এবং বলেন—"এই যে দুর্গোৎসবটি, এটী তোমরা সামান্য জ্ঞান করিও।.... বিলক্ষণ ঠেকিয়া এই দুর্গোৎসবটি আরম্ভ করিয়াছি। আমি এখন বুঝিয়াছি যে, ভগবতীর আরাধনা করিলে ধনসম্পদ হয়।"[৭]

পঞ্চমী তিথিতে দুর্গাপুজোর মন্দিরে বন্ধুদের সঙ্গে বসে আছেন। স্বদেশী কোম্পানী খুলে অনেক টাকা উপার্জন করেছেন—

অকপটে সকলের সামনে স্বীকার করলেন। কারণ তিনি তাঁর কোনো কাজকেই খারাপ বলে মনে করেননি।

ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সমাজে অনেক অসৎ মানুষের মুখ ও মুখোশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ডমরুধর তাদেরই একজন প্রতিনিধি মাত্র। তাঁর সমকালে এইরকম অসৎ মানুষের ব্যাপক উপদ্রব বেড়ে গেলেও এটা নিছক তৎসাময়িক সমস্যা নয়। সব সমাজেই এরকম অসৎ লোকের দেখা পাওয়া যায়। শোষণভিত্তিক সমাজ-কাঠামোয়, অশিক্ষা ও দারিদ্রের দেশে এ'এক চিরন্তন সামাজিক সমস্যা। এর মূলে রয়েছে মন ও কর্মের বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যই নানাভাবে যুগে যুগে দেশে দেশে নয়নচাঁদ, ডমরুধর, অথবা গন্ডেরিরাম বা শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বিরিঞ্চিবাবার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই প্রসঙ্গে শেয়ার মার্কেটের ব্যবসার কথা একটু বলা প্রয়োজন। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে শেয়ার বাজার ছিল প্রতারণার মস্ত বড় ফাঁদ। স্বাধীন ভারতে যাবতীয় লিমিটেড কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় শেয়ার বাজারে লগ্নির ব্যাপারটা কম ঝুঁকিপূর্ণ হ'য়ে যায়। তবুও স্বাধীন ভারতে বিংশ শতাব্দীর ন'য়ের দশকে বড়ো মাপের শেয়ার-কেলেঙ্কারির ঘটনা আমাদের কারোরই নজর এড়ায়নি। সে যাই হোক, পরাধীন দেশে কলকাতা নামক বাণিজ্য নগরীতে তখন শেয়ার-বাজার খুবই জমজমাট। 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পটিতে এই শেয়ার বাজারের শিথিল নিয়ন্ত্রণ ও প্রতারণামূলক ব্যবস্থার প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয়েছে।

শেয়ার-বাজার ইংরেজদের সৃষ্টি। তারাই বুর্জোয়া সভ্যতার স্রষ্টা, তাদের হাতেই মার্কেন্টাইল ইকোনমির প্রতিষ্ঠা।, সাগর পেরিয়ে সেই অর্থনীতির ঢেউ এসে প্রবেশ করেছিল আমাদের দেশেও। শেয়ার বাজার কোনো একটি প্রদেশের বাণিজের কেন্দ্রস্থল, আবার ভোজবাজির প্রধান কেন্দ্রও বটে। কারণ প্রকৃত ব্যবসার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধে জেতার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত ক'রে কলকাতায় নিয়ে আসে, তখনই কলকাতায় প্রধান বাণিজ্য নগরী বা বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেই সুবাদেই গড়ে ওঠে শেয়ার-বাজার। জানা যায়, স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় শেয়ার বাজারে ব্যবসার সুবাদে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে অনেক শিল্পের জাতীয়করণ হবার ফলে শেয়ার বাজারের ভূমিকা কিছুটা স্তিমিত হ'য়ে যায়। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের উদার অর্থনীতি ও বিলগ্নীকরণের ফলে বিংশ শতাব্দীর ন'এর দশকে শেয়ার বাজার আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে এবং শতাব্দীর সর্ববৃহৎ কুখ্যাত শেয়ার-কেলেঙ্কারি এই সময়েই ঘটে। সে যাই হোক, শেয়ার বাজারের মূল কথা হলো লাভজনক কোনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তাদের বিনিয়োগের টাকা বাজার থেকে তুলে নেবার জন্য মালিকানার শেয়ার খোলাবাজারে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু যিনি এই শেয়ার কিনবেন (এরও একটি সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা আছে) তিনি কোম্পানির মালিকানার অংশীদার হবেন না বটে, কিন্তু লভ্যাংশের (profit) দাবিদার হবেন। এই সুযোগে মালিক বা লগ্নীকারী তাঁর বিনিয়োগের পুরো অর্থটাই শেয়ার বাজার থেকে তুলে নিতে পারেন। এই সুযোগ ও ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হ'য়ে এমনও দেখা গেল যে কোম্পানির উৎপাদন শুরু হবার আগেই, উদ্বোধনের সময়েই তার যাবতীয় শেয়ার বিক্রি হ'য়ে গেল। তারপর কোম্পানি যদি আদৌ উৎপাদন না ক'রে ব্যবসা গুটিয়ে দেয়, তাহ'লে তাদের ধরার উপায় ছিল না। প্রতারিত হতেন ক্রেতারা। আইনী রক্ষাকবচ সেকালে ছিল খুবই শিথিল, ছিল না বললেই চলে।

ত্রৈলোক্যনাথের 'স্বদেশী কোম্পানী' এবং পরশুরামের "শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" গল্পে শেয়ারবাজারের এই প্রতারণার চরিত্রই ফুটে উঠেছে।

এই গল্পের দর্পণে দেখা যাচ্ছে শেয়ার বাজার, বাণিজ্য-বুদ্ধির স্থূলতা, ধাপ্পাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি ব্যাপারে ত্রৈলোক্যনাথের পর্যবেক্ষণ বেশ স্বচ্ছ ও গভীর। এই স্বচ্ছ ও গভীর পর্যবেক্ষণই তাঁর সমাজবীক্ষার আদলটি গড়ে দিয়েছে, উপস্থাপনের কৌশল, লেখকের দৃষ্টিকোণগত অবস্থান এবং ব্যঙ্গাত্মক সিচ্যুয়েশন নির্মাণের মধ্যেই ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষা সরাসরি পাঠক ও বৃহত্তর সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। তাঁর সমাজচেতনা শুধু সমস্যার স্বরূপ উন্মোচনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তাকে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণে জর্জরিত করেই তৃপ্তি খুঁজে পায় না, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে অর্থাৎ ডমরুধরের মুখোশের আড়ালে আসল মুখও চিনিয়ে দেয়। এখানেই ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষাজাত সামাজিক দায়ের চরমোৎকর্ষ। 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পটির অন্তর্নিহিত সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে সমালোচক শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন—

"স্বদেশীয় হিড়িকে যে কত অসাধু লোক নিজেদের পকেট ভারী করেছে তা নিয়েও ত্রৈলোক্যনাথ তাই আঘাত করেছেন।"[৮]

অন্যত্র, এই প্রসঙ্গেই শিশিরবাবু লিখেছেন—

"স্বদেশী কোম্পানীর নামে ভয়াবহ, নির্বিকার জুয়াচুরি এবং পরিশেষে নিজের পাপের সঙ্গীদের বঞ্চনা— অর্থাৎ বড় 'ভিলেনের' গুণগুলিও ডমরুধর আয়ত্ত করেছেন। ডমরুধরে শুধু যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে গলদ তারই প্রতি ব্যঙ্গ আছে তাই নয়— চিরন্তন বাংলাদেশের সার্বজনীন পূজা, স্বদেশী বা ঐ জাতীয় রাজনৈতিক হুজুগ প্রভৃতির অন্তঃসারশূন্যতা ও কয়েকটি লোকের আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রতি কটাক্ষ।"[৯]

ত্রৈলোক্যনাথের অমর সৃষ্টি নয়নচাঁদ ও ডমরুধর প্রসঙ্গে সমালোচক অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে আমরা বর্তমান আলোচনার উপসংহার করতে পারি—

"ব্যঙ্গ সাধারণত নীতিমূলক ও শাস্তিদায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ কোন কোন স্থানে নীতি ও শাস্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিছক আমোদকেই উদ্দেশ্য করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নয়নচাঁদের ব্যবসা ও ডমরুচরিতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নয়মচাঁদ ও ডমরুধর দুইজনেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও জাল-জুয়াচুরি দ্বারা নিজেদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। সুতরাং একটি নীতি নির্দেশিত পরিণাম হয়তো তাহাদের লাভ করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখক সেদিক দিয়া যান নাই।"[১০]

আসলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে গল্প বলেও লেখক মজা উপভোগের শর্তটি শেষাবধি মান্য করতে চেয়েছেন। তাই ডমরুধরের কোনো শাস্তির কথা লেখক ভাবেননি। 'চঞ্চলার গাই গরু' গল্পাংশে অবশ্য ক্ষীণ শাস্তির উল্লেখ আছে, তা অবশ্য বেশ লঘু এবং কৌতুকপ্রদ। এবং অবশ্যই স্বপ্ন-দৃষ্ট, স্বল্পস্থায়ী ঘটনা! তাছাড়া ডমরুধর নিজেই নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে, সেখানেই বোধহয় তার নৈতিক শাস্তির দাবি লঘু হ'য়ে গিয়েছে।□

উল্লেখপঞ্জিঃ

১. দ্র.'ডমরুচরিত'/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ সুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত/ কলকাতা, ১৪১০/ পৃঃ ৪৬৪
২. তদেব/ পৃঃ ৪৬৪
৩. দ্র. স্বদেশীকোম্পানী / ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ পৃঃ ৫১৬
৪. তদেব/ পৃঃ৫১৬
৫. তদেব / পৃঃ ৫১৬
৬. দ্র. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/ সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ/ কলকাতা, ১৯৮৪/ পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬
৭. দ্র. 'ডমরুচরিত'/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ সুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত/ পৃঃ ৪৪৯
৮. দ্র. বাংলা ছোটগল্পঃ ১৮৭৩-১৯২৩/ কলকাতা, ১৯৮৩/ পৃঃ ১৪০
৯. তদেব/ পৃঃ ১৪১-১৪২
১০.দ্র. বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা/ কলকাতা, ২০০২/ পৃঃ ২৫৪

৩. (খ) ৪. গল্প-বিশ্লেষণ ঃ'ঢাক মহাশয়' (১৯২৩)
['ডমরুচরিত'গল্পগ্রন্থে সংকলিত, প্রথম প্রকাশ-আগস্ট,১৯২৩]

'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থের সপ্তম গল্পের কোনো নাম নেই। তবে, এই সপ্তম গল্পের সাতটি পরিচ্ছেদ পৃথক পৃথক উপ-শিরোনাম চিহ্নিত। এর মধ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'ঢাক মহাশয়' উপ-শিরোনামে চিহ্নিত। এই পরিচ্ছেদটিকে আমরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হিসেবে গ্রহণ করতে চাই এবং শুধু এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভিত্তিতেই আমরা ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার একটি বিশেষ দিক বুঝে নিতে পারি। বস্তুতঃ ত্রৈলোক্যনাথের গল্পমালার বৈশিষ্ট্যই এইরকম— একটি গল্পের ভিতরে অনেকগুলি টুকরো গল্পমালার আকারে সজ্জিত থাকলেও যেকোনো একটি টুকরো গল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হিসেবে গ্রহণ ক'রে তার পাঠগ্রহণ ও রসাস্বাদন করা যায়। এই নমনীয়তা (flexibility) বৈশিষ্ট্যের গুণেই আমরা 'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থের সপ্তম গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ('ঢাক মহাশয়')কে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গল্প হিসেবে গ্রহন ক'রে তার বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছি।

ধর্মীয় সংস্কারের আবরণ দিয়ে ঊনিশ ও বিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজে কী নিষ্ঠুর নারী নির্যাতন ঘটত, 'ঢাক মহাশয়' গল্পটি তার বিশ্বস্ত দর্পন। শুধু নারীনির্যাতন নয়, এ গল্পকে বিধবা নারীর ওপর পুরুষ-আধিপত্যের ব্রাহ্মণ্য সমাজের নির্যাতনের চিত্র হিসেবেও দেখা যেতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথের গভীর সমাজবীক্ষার ফলশ্রুতি এই গল্পটি। তাঁর শিল্পীবিবেক এখানে তীব্র ব্যঙ্গে ঝলসে উঠেছে। উপস্থাপনের মধ্যে যে তীব্র শ্লেষ, তার নিহিত নির্যাসটুকু গ্রহণ করলে ত্রৈলোক্যনাথকে একজন প্রতিবাদী শিল্পী বলেই মনে হবে। একই সঙ্গে নিপীড়িত নারী সম্পর্কে তাঁর গভীর সহানুভূতিও লক্ষ্য করবার মতো। এবার আমরা গল্পটির কাহিনি-সংক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

কাহিনি-সংক্ষেপঃ

শুক্লাম্বর ঢাক মহাশয় গুরুগিরি করেন। তাঁর অনেক শিষ্য আছে। গুরুগিরি ক'রে তাঁর ভালোরকম উপার্জনও হয়। তিনি দোতলা কোঠাবাড়িতে বাস করেন। অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পূজা-আহ্নিক, জপ-তপে সময় অতিবাহিত করেন। আজকাল ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা-আহ্নিক করে না। সন্ধ্যা-আহ্নিকে যাতে লোকের আগ্রহ জন্মায়, সে-বিষয়ে তিনি চেষ্টা করেন। এদিকে শুক্লাম্বর ঢাক মহাশয়ের পরম বন্ধু ডমরুধর। ডমরুধর তাঁর পরম হিতৈষী ও বিশ্বস্ত পরমর্শদাতা হিসেবে গল্পে আবির্ভূত হয়েছে।

ঢাক মহাশয়ের কন্যা কুন্তলা। আট বৎসর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের দু'-মাস পরেই বিধবা হ'য়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে। এখন তার বয়স নয় বৎসর। কোনো এক একাদশীর তিথিতে কুন্তলার প্রবল জ্বর হয়েছে। প্রচলিত সমাজবিধি এবং ঢাক মহাশয়ের শাস্ত্রে রয়েছে একাদশীর দিন বিধবাদের নির্জলা উপবাসে থাকতে হয়। সেই নিয়মানুযায়ী কুন্তলাকেও নির্জলা উপবাস পালন করতে হবে। কিন্তু প্রবল জ্বরে কুন্তলার শরীরের উত্তাপ আগুনের ন্যায় হয়েছে। তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে ক্রমাগত এ পাশ ও পাশ করছে এবং কাতর প্রার্থনায় মায়ের কাছে জল চাইছে। কুন্তলার মা বিষণ্ণ বদনে মেয়ের কাছে বসে বাতাস করছেন এবং নিজের অসহায়তার জন্য চোখের জল মুছছেন। আপন কন্যাকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল দেবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বামীর আদেশে দিতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত ডমরুধরের কথামতো ঢাক মহাশয় কুন্তলাকে কিছুতেই জল না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। রাত্রিতে যদি কুন্তলা জল চুরি ক'রে খায়, অথবা তার কষ্ট দেখে মা, বোন বা অপর কেউ জল দেন, এই ভেবে ঢাক মহাশয় তাকে নীচের তলার একটি ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রাখলেন। সারারাত অসুস্থ কুন্তলা একা সেই ঘরে বন্দিনী হ'য়ে রইল। ধর্মরক্ষার ব্যাপারে ঢাক মহাশয় এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কোনো আবেগ বা হৃদয়গত দুর্বলতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতে রাজী নন।

সকালবেলায় ঢাক মহাশয় যখন ঘরের তালা খুললেন, তখন সকলে দেখল যে, কুন্তলা পিপাসায় অজ্ঞান হ'য়ে ঘরের ভেজা মেঝের এক ধার হতে অপর ধার পর্যন্ত সারারাত বারবার লেহন করেছে। শেষে, অজ্ঞান হ'য়ে ঘরের এক কোণে প'ড়ে রয়েছে। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন, কিন্তু তার মাথাটি লুটিয়ে পড়ল। সেদিন দ্বাদশী। মা তার মুখে জল দিলেন, কিন্তু সে গিলতে পারল না। দুই কষ দিয়ে জল বাইরে এসে পড়ল। সে আর কোনো কথা বলল না। অন্তিমবেলায় 'জল' 'জল' বলে সে প্রাণত্যাগ করল।

এই ঘটনার কথা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন দেশশুদ্ধ লোক ঢাক মহাশয়কে ধন্য ধন্য করতে লাগল। তাঁর প্রতি লোকের অগাধ ভক্তি আরও বেড়ে গেল এবং একমাসের মধ্যে তাঁর শতাধিক নতুন শিষ্য হলো।

কন্যার মৃত্যুতে ঢাক মহাশয়ের প্রভূত আনন্দ হলো এবং বললেন; বিধবা হ'য়ে চিরজীবন দুঃখে যাপন করার চেয়ে

মরাই ভালো। কিন্তু মৃত কুন্তলা বেশিদিন আনন্দ ভোগ করতে দিল না। কুন্তলার আত্মা যখনই গভীর রাত্রে বাড়ির চতুর্দিকে জল,জল, বলে চিৎকার করে তার দু'চারদিন পরই একজনের মৃত্যু হয়। প্রথমে, ঢাক মহাশয়ের পুত্র, পরে মাতঙ্গিনী নামে এক দাসী, তারপরে ছট্টু নামক এক ভৃত্যের মৃত্যু হলো। বিধবা হ'য়ে একাদশীর দিন ঘরের মেঝে লেহন ক'রে তার থেকে জল আহরণ করা খুব সামান্য পাপ নয়! এমন কি গয়ায় পিন্ড দিলেও এই পাপের পরিত্রাণ হয় না, ক্ষয় হয় না!

সপ্তম গল্পের পরবর্তী অংশে কুন্তলা-প্রসঙ্গ আর নেই! সেখানে ঢাক মহাশয়ের অপর কন্যা কালিকা দেবীর স্বামীর সঙ্গে পুণর্মিলনের আকাঙ্খা, মোল্লা জামাতা, বাগদাদের জিন—এইসব প্রসঙ্গ এসেছে। সুতরাং কুন্তলা-বৃত্তান্ত এখানেই শেষ।

গল্পের দর্পণে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষাঃ

আমাদের সমাজের যা কিছু অসত্য যা কিছু কৃত্রিম ও ছদ্মবেশী তার প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের ছিল আন্তরিক অশ্রদ্ধা বা বিরূপতা। এই অশ্রদ্ধেয় বিষয়গুলি একান্তভাবে সামাজিক গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তির জীবনাচরণের অন্তর্গত, তাই এসব অপছন্দের বিষয় জানাবার জন্য তিনি সরাসরি সমাজ বা রাষ্ট্রকে আক্রমন করেননি, আক্রমণ করেছেন অসঙ্গতির ঘটনাগুলিকে। ধর্মীয় ভন্ডামি, ধর্মের মুখোশের পেছনে অমানবিক নিষ্ঠুরতার ধারাবাহিক ইতিহাস, আচারসর্বস্ব প্রথানুগত প্রদর্শনমূলক জীবনযাত্রা চিরকালই ত্রৈলোক্যনাথের সামাজিক ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। হাসির হালকা আবরণের মাধ্যমেই তিনি আমাদের সমাজ ও পরিবার জীবনের গভীর সত্যগুলি উচ্চারণের প্রয়াস পেয়েছেন।

সাধারণভাবে ধর্মের আড়ম্বর-আতিশয্য, প্রদর্শন মূলকতা এবং যাবতীয় ভন্ডামি ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পেও আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়েছে। 'ঢাক মহাশয়' গল্পটি মূলত বালবিধবার ওপর অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতনের গল্প, নিছক নারী নির্যাতনের গল্প নয়। ১৯২৩-এ এই গল্প যখন প্রকাশিত হয়, তখন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের আন্দোলন এবং এ'সংক্রান্ত সরকারি আইন বেশ পুরনো হ'য়ে গেছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের গভীর সমাজবীক্ষা দেখিয়েছে যে, সমাজের অভ্যন্তরে সংস্কারান্ধ পশ্চাদ্‌গামিতা অনড় অটল হ'য়ে বিরাজ করছিল, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-নির্ভর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য প্রশ্নাতীত দাপটের সঙ্গে ছড়ি ঘোরাছিল। মানবিকতার কাছে দায়বদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত অগ্রসরতার যুগেও গ্রামীণ বঙ্গদেশের এক নিষ্ঠুর নারীমেধ-(নির্যাতন না বলে একে হত্যাকান্ড বললেই ঠিক বলা হয়) এর কাহিনি উপস্থাপন ক'রে পাঠক এবং সমাজপতিদের শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

এই গল্পে লেখকের সমাজবীক্ষার তাৎপর্যকে আমরা তিনটি দিক থেকে দেখতে পারি— (১) ধর্মীয় প্রথার বলি একটি নিষ্পাপ বালিকা, (২) কন্যাসন্তান তখনকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ছিল রীতিমত অবাঞ্ছিত এবং (৩) ধর্মের নামে যে যত বেশি পরিমাণে অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারবে সংস্কারবদ্ধ সমাজের কাছে তার আপোসহীন ধর্মনিষ্ঠ ভাবমূর্তি তত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করবে, এমনকি তা যদি হত্যাকান্ডের মতো মর্মান্তিক ঘটনাও হয়।

প্রথমেই বলা যাক যে, প্রবল জ্বরাক্রান্ত কুন্তলার মৃত্যু আসলে যেকোনো সাধারণ মৃত্যু নয়, এ'ঘটনা ঠান্ডা মাথায় হত্যাকান্ড। তার পিতা ঢাক মহাশয়ই তাকে পরিকল্পিতভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। যাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খুন বলাই যায়। বৈধব্যের সঙ্গে একাদশীর উপবাস-ব্রত উদযাপনের সংস্কার সেকালের সমাজে কত দৃঢ়মূল ছিল তা উনিশ শতকের বিভিন্ন নাটক প্রহসন ও উপন্যাসে প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায়। ত্রৈলোক্যনাথেরই 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পের ষষ্ঠ পর্বে জনৈক নেই আঁকুড়ে দাদা-র বিধবা ভগিনীর একাদশীর দিন আঙট পাতায় ভাত খাবার বাসনা জাগ্রত হওয়ায় যমরাজ তার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারবার হুকুম দিয়েছিলেন। ধর্ম ও প্রথার ছদ্মবেশে এইরকম নিষ্ঠুর নারী নির্যাতনের ঐতিহ্য ত্রৈলোক্যনাথকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে, সেইজন্য দু'টি গল্পে একই সমস্যার উল্লেখ।

কুন্তলা যে অমানবিক ধর্মীয় প্রথার বলি, এবং ঢাক মহাশয় তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন, সেকথা স্পষ্ট হয় বর্ণনার ক্রম লক্ষ্য করলে। প্রথমে অসহায় বালিকার তৃষ্ণাকাতরতা মর্মন্তুদ ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক—

"জ্বরে কুন্তলার কাঠ ফাটিতেছে। আগুনের ন্যায় শরীরের উত্তাপ হইয়াছে।.... মা একটু জল দাও, মা একটু জল দাও, ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে। মা! পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। একটু জল দাও মা! একটুখানি দাও। কেবল মুখটি ভিজাইয়া দাও। একটু জল না খাইয়া আর থাকিতে পারি না। জল,জল,জল।'"

এই কাতরতার অপর পিঠেই রয়েছে অমানবিক নিষ্ঠুরতা। ঘটনাক্রম অনুসরণ করলে দেখা যাবে—

১. ঢাক মহাশয় নিজে অগ্রসর হ'য়ে বালিকা-কন্যার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল দেননি।

২. নিজে না দিলেও বাড়ির আর কাউকে জল দিতে আদেশ করেননি অর্থাৎ পরোক্ষ বন্দোবস্তটুকুও করেননি।

৩. বরং কুন্তলার মা বা অন্যরা ঢাক মহাশয়ের গঞ্জনা বা শাস্তির ভয়ে (ধর্মভয়েও বটে) বালিকার মুখে জল দেবার সাহস অর্জন করতে পারেননি!

ঢাক মহাশয়ের নিম্নকণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে জানা যাচ্ছে— '...জল দিতে বারণ করিয়াছি। কিন্তু জল দিতে আমার গৃহিণীর ইচ্ছা।' অর্থাৎ ধর্মভীরুতা যতই অলঙ্ঘনীয় হোক না কেন, মায়ের মন সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক নিয়মেই স্নেহকাতর। মায়ের কোমল নারীহৃদয় মানবিকতায় উষ্ণ। তা যাতে শাস্ত্রীয় বিধি বা চিরকাল প্রচলিত ধর্মীয় প্রথা লঙঘনের দুঃসাহস দেখাতে না পারে, সেজন্য ঢাক মহাশয় ডমরুধরের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, উপায় জানতে চেয়েছেন। মূর্তিমান শয়তান ডমরুধর ঢাক মহাশয়কে ধর্মলঙঘনের ভয় দেখিয়ে আরও বেশিরকম অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে—

"জল কি দিতে পারা যায়? ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন জল খাইতে দিলে তাহার ধর্মটি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।"[২]

অতএব নিচের ঘরে কুন্তলাকে তালা বন্ধ ক'রে চাবি নিজের কাছে রাখলেন। নিচের বর্ণনাংশে কুন্তলার তৃষ্ণাকাতরতা ও তার বিপ্রতীপে ঢাক মহাশয়ের অমানবিক নিষ্ঠুরতা এবং শেষে লেখকের তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—

"কন্যাকে জল দিলেন না। রাত্রিতে কন্যা পাছে নিজে জল চুরি করিয়া খায়, অথবা তাহার কষ্ট দেখিয়া মাতা, ভগিনী কি অপর কেহ পাছে তাহাকে জল প্রদান করে, সেজন্য সন্ধ্যার সময় কুন্তলাকে তিনি নীচের তলার এক ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি পীড়িতা কন্যা একেলা সেই ঘরে রহিল। ধর্মরক্ষা সম্বন্ধে ঢাক মহাশয়ের এমনি দৃঢ়পণ।"[৩]

পরের দিন সকালে কুন্তলার মৃত্যু। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কুন্তলা যা করেছে, হয়তো সেই বর্ণনায় কল্পনার আতিশয্য আছে, কিন্তু এই আতিশয্য যদি ধর্মীয় প্রথার অমানবিক নিষ্ঠুরতার দিকটিকে প্রকটিত করে তা'হলে পাঠকের আপত্তি নেই—

"তখন সকলে দেখিল যে, বালিকা পিপাসায় হতজ্ঞান হইয়া ঘরের ভিজা মেঝের একধার হইতে অপর ধার পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি বারবার চাটিয়াছে। অবশেষে অজ্ঞান হইয়া ঘরের এককোণে পড়িয়া আছে।"[৪]

অতঃপর কুন্তলার মৃত্যু। বলা বাহুল্য, এই মৃত্যুর জন্য ধর্মীয় কুপ্রথা যতখানি দায়ী, ঢাক মহাশয় এবং ডমরুধরও কিছু কম দায়ী নয়। এরা সবাই একযোগে কুন্তলাকে হত্যা করেছে।

ধর্মান্ধতা কতখানি নিষ্ঠুর হ'তে পারে, সাধারণ মানুষ কীভাবে মানবিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে কুসংস্কার ও ধর্মানুগত্যকে স্থান দেয় তার প্রমাণ এবং দেশবাসীর এহেন অমানবিক মনোভাবের প্রতি ব্যঙ্গ পরবর্তী বিবরণে—

"এই ঘটনার কথা যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন দেশশুদ্ধ লোক ঢাক মহাশয়কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সকলে বলিল—"কি দৃঢ় মন! কি ধর্মের প্রতি আস্থা! এরূপ পুণ্যবান লোক কলিকালে হয় না। তাঁহার প্রতি লোকের এত ভক্তি হইল যে, একমাসের মধ্যে তাঁহার এক শতের অধিক নূতন শিষ্য হইল।"[৫]

অর্থাৎ ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য কন্যা বিসর্জনের মতো চরম অমানবিক কাজকে নির্বিবেক সমাজ অনুমোদন করছে, অভিনন্দিত করছে— ত্রৈলোক্যনাথের এই সমাজবীক্ষা ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনের মধ্যেই প্রকাশের ভাষা খুঁজে নিয়েছে।

সবশেষে বলতে হয় আমাদের সমাজে বহুকাল প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের কথা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যাজন্ম তখনও বাঞ্ছনীয় ছিল না, এখনও সাদরে গৃহীত হয় না। ঢাক মহাশয়ও এই বৈষম্যমূলক মনোভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই কুন্তলার মৃত্যুতে তাঁর প্রভূত আনন্দ হয়েছে—

"কন্যার মৃত্যুতে ঢাকমহাশয়ের আনন্দ হইল।"[৬]

এবং চারদিন পরে পুত্রের মৃত্যুতে—

"ইহার চারিদিন পরে ঢাক মহাশয়ের পুত্রটি মরিয়া গেল। এইবার ঢাকমহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।"[৭]

ত্রৈলোক্যনাথের লেখনী এখানে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শ্লেষাত্মক।

অধ্যাপিকা ব্রততী চক্রবর্তী এই গল্পটির সমাজবীক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"বাঙালী নারীর ওপর সমাজনেতাদের সুদীর্ঘকালের অত্যাচারের একটি মর্মান্তিক ছবি পাওয়া যায় ডমরুচরিতের শেষ গল্পে। একটি নিতান্ত শিশু বিধবা কন্যাকে একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাসে একাকি ঘরে বন্ধ রেখে যেভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং সমাজনেতারা নিজেদেরই তৈরী সমাজবিধির অনুশাসনে যেভাবে গর্ববোধ করেছে তা লেখকের সঙ্গে সঙ্গে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকদেরও বিচলিত, ক্রুদ্ধ,ব্যথিত করে।"[৮]

সমালোচক পবিত্র অধিকারীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে আমরা এই আলোচনার উপসংহার করব। গল্পটির নিহিত সমাজ বাস্তবতা বিশ্লেষণ ক'রে পবিত্র অধিকারী বলেছেন—

"ডমরুধরের মুখনিঃসৃত এই গল্পে ঊনিশ শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজে নারীলাঞ্ছনার এক মর্মন্তুদ খন্ডচিত্র ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের উপহার দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন যথার্থই একজন মানবদরদী লেখক। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ছিল বলেই যেকোনো বর্বরোচিত আচরণ তাঁর ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে।"[৯]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি 'ঢাক মহাশয়' গল্পটি ত্রৈলোক্যনাথের গভীর সমাজবীক্ষার এবং জাগ্রত শিল্পীবিবেকের দায়বদ্ধ ও প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১. দ্র. 'ঢাকমহাশয়'/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ সুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত/ পৃঃ-৫৪০
২. তদেব/ পৃঃ-৫৪০
৩. তদেব /পৃঃ-৫৪০
৪. তদেব/ পৃঃ-৫৪১
৫. তদেব/পৃঃ-৫৪১
৬. তদেব/ পৃঃ-৫৪১
৭. তদেব/ পৃঃ-৫৪১
৮. দ্র. 'ত্রৈলোক্যনাথ ও বাংলা সরস গল্পের ঐতিহ্য'/ ছোটগল্পঃ বিকাশ পরিণতি উপলব্ধি/ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ও জ্যোতিপ্রসাদ রায় সম্পাদিত/ কলকাতা, ২০০৪/ পৃঃ—৮
৯. দ্র. 'ত্রৈলোক্যনাথের গল্প'/ 'গল্পগুচ্ছ'/ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত/ শারদীয়া সংখ্যা, ২০০৮/ কলকাতা/ পৃঃ- ২০৮

৩. (খ) ৫. গল্প-বিশ্লেষণ ঃ'গাছে ঝোলা সাধু' (১৯২৩)
['ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থে সংকলিত, প্রথম প্রকাশ-আগস্ট, ১৯২৩]

'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পে তৃতীয় পরিচ্ছেদ হলো 'গাছে-ঝোলা সাধু'। এই গল্পটিকেও আমরা 'ঢাক মহাশয়'-এর মতো গল্পমালার থেকে খন্ডিত রূপে গ্রহণ করছি লেখকের সমাজবীক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য, কিন্তু নিবিড় পাঠ গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, এটি একটি স্বয়ংস্বতন্ত্র গল্প।

'ডমরুচরিত'-এর প্রথমগল্পটি সাতটি পরিচ্ছেদে পৃথক পৃথক উপ-শিরোনামে চিহ্নিত। এর মধ্যে তৃতীয় পরিছেদটি 'গাছে-ঝোলা সাধু' উপ-শিরোনামে চিহ্নিত। সপ্তম গল্পের 'ঢাক মহাশয়'-এর মতো এই গল্পটিকেও আমরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হিসেবে গ্রহণ করতে চাই এবং শুধু এই পরিছেদের বয়ানের ভিত্তিতেই আমরা ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারি। বস্তুতঃ ত্রৈলোক্যনাথের গল্পমালার বৈশিষ্ট্যই এইরকম— একটি গল্পের ভিতরে অনেকগুলি টুকরো গল্প মালার আকারে সজ্জিত থাকলেও যেকোনো একটি টুকরো গল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হিসেবে গ্রহণ ক'রে তার পাঠ গ্রহণ ও রসাস্বাদন করা যায়। নমনীয়তা-বৈশিষ্ট্যের গুণেই আমরা 'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদ ('গাছে-ঝোলা সাধু') কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হিসেবে গ্রহণ ক'রে তার বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছি।

ভারতবর্ষের মতো একটি অনগ্রসর দেশে, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের দাপট যেখানে ব্যাপক, সেখানে সাধারণ মানুষের ধর্মভীরুতাকে পুঁজি ক'রে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতারণা ও বুজরুকি এবং সাধারণ গৃহস্থ মানুষকে প্রলুব্ধ ক'রে, প্রতারণার ফাঁদ পেতে সোনাদানা টাকা পয়সা 'ডবল' বা দ্বিগুণ করার বুজরুকি এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। বুজরুকি-নির্ভর ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ত্রৈলোক্যনাথের শাণিত লেখনী এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ঝলসে উঠেছে। এই গল্পে আমরা প্রতিবাদী ত্রৈলোক্যনাথকে পাই। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' এবং 'গাছে-ঝোলা সাধু' এই দুই গল্পেরই কেন্দ্রীয় মোটিফ একই। বুজরুকি ও ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী মনোভাব। তবে, এ,প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই গল্পের পরিণতি কিছুটা যেন অমীমাংসিত। সাধু এসে ডমরুধরকে তার টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি সব দ্বিগুণ ক'রে দেবে এই প্রস্তাব দিল এবং সংশয় ও তর্কের পথ ছেড়ে ডমরুধর তাতে রাজী হলো। শুভ দিনে শুভ লগ্নে সাধু পূজা ও যজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন, ডমরুধর তাঁর সব সম্পত্তি সাধুকে দেবার জন্য দোতলার ঘরে গেলেন-এখানেই পরিচ্ছেদের তথা গল্পের সমাপ্তি। এরপরেই গল্প আত্মা, যমলোক, একের শরীরে অন্যের আত্মা ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রবিষ্ট হয়েছে।

গল্পটির সমাজবীক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণের পূর্বে গল্পটির কাহিনি-সংক্ষেপ জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

কাহিনি-সংক্ষেপঃ

গল্পটি আড্ডার গল্প, কথক ডমরুধর। গ্রামের শেষভাগে একটি চালাঘরে বিন্দি গোয়ালিনী বাস করে। জমি ডমরুধরের। গোয়ালিনীর মৃত্যুর পর সেই চালাঘরে এক অন্ধ সাধু ও তার দুই চেলা আশ্রয় নেয়। সাধুর বয়স পাঁচশত তিপ্পান্ন বছর। চালাঘরের সামনে একটি আমগাছ আছে। প্রতিদিন সকালবেলা চেলারা সেই আমগাছে সাধুর দুই পা বেঁধে নীচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দেয়। একঘণ্টা কাল সাধু এভাবে ঝুলে থাকে। গ্রামে এবং দূর-দুরান্তে এই খবর প্রচার হওয়ামাত্র শিক্ষিত ছেলেরা এসে কেউ সাধুর পা টিপতে লাগল, কেউ বাতাস করতে লাগল, সকলেই তার পাদোদক খেতে লাগল। এমনকি ইংরাজী কাগজের সাংবাদিক এসে সাধুকে দেখে তাদের কাগজে সাধুর মহিমা লিখল সবিস্তারে। চেলারা সাধুর মাথার নিচে একটি ধামা রেখে দিত আর সেই ধামাতে লোকেরা রোজ দু'চার পয়সা দিত এবং এর ফলে তার রোজগার ভালোই হতো।

ডমরুধর বিষয়ী মানুষ। জমি চালাঘর সবই তার। তাই সাধুর রোজগারের অর্ধেক অংশ ডমরুধরকে ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে দিত। কিন্তু এই আদায় বেশিদিন স্থায়ী হলো না। চার ক্রোশ দূরে রসিক মন্ডলের সাত বছরের মেয়ের কাঁধে জনৈক মাকাল ঠাকুর ভর করলেন। সেই ভর-গ্রস্ত মেয়ে সকলকে ঔষধ দিয়ে সব রকমের রোগীকে সুস্থ ক'রে তুলল। এই খবর চারিদিকে পৌঁছতেই ইংরেজি কাগজের লোক তুলসীর মালা গলায় দিয়ে সেইখানে সংবাদ-সংগ্রহে গেল এবং তাদের কাগজে এই খবর বিস্তারিতভাবে লিখল। উচ্চশিক্ষিত ছেলেরা সাধুকে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটির পাদোদক জল খেতে লাগল। বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রচুর লোকের সমাগম হলো। রসিক মন্ডলের ঘরে টাকা-পয়সা আর ধরে না।

ইতিমধ্যে ডমরুধরের ঘরে সাধুর মাধ্যমে আসা রোজগার বন্ধ হ'য়ে গেল। আফসোসে তাঁর বুক ফেটে যেতে লাগল। একদিন সাধু চেলাকে সঙ্গে নিয়ে ডমরুধরের বাড়ি উপস্থিত হলেন এবং সহজে ধনলাভের অন্য একটি পথ দেখালেন।

ম্যাজিজের এক টাকাকে দু'টাকা, দশ টাকাকে বিশ টাকা, একটি মোহরকে দু'টি মোহরে পরিণত করলেন। এভাবে যেকেউ বিপুল ধনের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু তা করতে গেলে পূজাপাঠের প্রয়োজন। পূজা পাঠ ক'রে ডমরুধরের যত টাকা-মোহর-সোনারূপা আছে সবই ওই সাধু দ্বিগুণ ক'রে দেবেন। প্রথমে ডমরুধর সাধুর কথাতে রাজী হলেন না। কিন্তু সাধু নাছোড়বান্দা। তিনি অন্ধ, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, পূজা-পাঠ ক'রে তিনি কোথাও চলে যাবেন না, ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকবেন, পূজার দিন কোনো শিষ্যও সেখানে উপস্থিত থাকবে না, পূজা শেষ হওয়ামাত্র খুলে দেখবে যাবতীয় সম্পত্তি দ্বিগুণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সাধুর কথায় ডমরুধর রাজী হলেন। শুভ দিন-ক্ষণ দেখে বাড়ির দোতলায় পূজা ও হোমের আয়োজন করা হলো। তাঁর ঘরে যত টাকা, মোহর, গহনা ছিল সবই বাক্সের মধ্যে বন্ধ ক'রে ডমরুধর পূজার স্থানে নিয়ে গেলেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ। এরপরের পরিচ্ছেদে ডমরুধরের আকস্মিক পতন, তাঁর সূক্ষ্ম শরীরের ঊর্ধ্বলোকে গমন, যমপুরীতে ভ্রমণ এবং আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে যার সঙ্গে বর্তমান গল্পটির সম্পর্ক নেই বললেই হয়।

গল্পের দর্পণে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার স্বরূপঃ

'গাছে-ঝোলা সাধু' ধর্মব্যবসায়ীদের ও ভন্ড তপস্বীদের সমালোচনায় মুখর গল্প। ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত দেশে সমাজের সাধারণ মানুষের ধর্মভীরুতাকে সম্বল ক'রে ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে যে ঠকবাজ সাধুর আবির্ভাব ঘটে, যারা ক্রমাগত সাধারণ মানুষকে ঠকায় তাদের মুখোশ খুলে দেবার জন্যই এ' গল্পের অবতারণা। ধর্মভীরুতার জন্যই ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ দুর্বলচিত্ত। তাই যেখানেই সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া যায় সেখানেই লোক ভিড় করত। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, শিক্ষিত ছেলেরাও ভিড় জমাত—

"সাধুর দুইটি চক্ষু অন্ধ। চেলারা বলিল যে, তাহার বয়স পাঁচশত তিপ্পান্ন বৎসর। চালাঘরের সম্মুখে যে আমগাছ আছে চেলারা তাহার ডালে দুই পা বাঁধিয়া দিত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল নীচের দিকে মুখ করিয়া সাধু ঝুলিয়া থাকিত। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি.এ, এম.এ পাশ করিয়াছে, সেই ছোঁড়ারা আসিয়া সাধুর কেহবা পা টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল।"[১]

সামাজিক অভিজ্ঞতায় ত্রৈলোক্যনাথ দেখেছেন,ভারতবর্ষের মানুষ ঐহিক সুখ ও ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসাবে বিভিন্ন ঠাকুর- দেবতা সাধু ও মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ থেকে শিক্ষিত ছেলেরাও বাদ যায় নি। এখানেই ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ সবচেয়ে প্রকট ও তীক্ষ্ণ।

ডমরুধর অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, শঠওধূর্ত। কিন্তু সে সহজেই সব কথা বলে দেয়, স্বীকার করে। ত্রৈলোক্যনাথ তার এই স্বভাবের জন্য হেসেছেন আবার করুণাও প্রকাশ করেছেন।

এই ধরনের ভন্ড সাধুরা কীভাবে নিরীহ গৃহস্থ মানুষকে কথার জালে মোহগ্রস্ত করত তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই উক্তিতে—

"আমরা উদাসীন। আমি নিজে বায়ু ভক্ষণ করি। চেলারা এখনও যৎকিঞ্চিৎ আহার করে। দীনদুঃখীকে আমরা কিছু দান করি। কোন পরিব্রাজক আসিলে তাহার সেবায় কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করি।সেজন্য পুণ্যাত্মা ভক্তগণ যাহা প্রদান করেন, আমার শিষ্যদ্বয় এ স্থানের খরচের জন্য তাহার অর্ধেক রাখিয়া অবশিষ্ট ধন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে দিয়া আসিবে।"[২]

এই ধরনের কথা নিঃসন্দেহে শ্রোতাদের মনে মায়াজাল সৃষ্টি করে। এই গল্পে সাধুর তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা মূলত বচন-মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই সবদেশে (বিশেষত অনুন্নত দেশে) ধর্মকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রেই ধর্মকে সামনের সারিতে রাখা হয় আর তার পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে স্থূল বাণিজ্যবুদ্ধি। লক্ষণীয় যে, সাধুর টাকা 'ডবল করা'র প্রস্তাবকে ডমরুধরের মতো খল প্রকৃতির লোকও সরাসরি 'বুজরুকি' বলে চিহ্নিত করেছে।

রসিক মন্ডলের সাত বছরের মেয়ের কাঁধে মাকাল-ঠাকুর ভর করেছে এবং গাছান্ত ঔষধ দিয়ে বিভিন্ন রোগীকে সুস্থ ক'রে তুলছে। এই কথা প্রচার হওয়ামাত্র কাতারে কাতারে লোক এসে ভিড় জমালো এবং রসিক মন্ডলের ঘরে প্রচুর টাকা পয়সা এলো। ঠাকুর দেবতার নাম ক'রে বা ধর্মীয় দুর্বলতাকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে কিছু মানুষকে লাভজনক ব্যবসায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। মানুষের দুর্বলতা বা অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ধর্মব্যবসা ফুলে-ফেঁপে ওঠার দৃশ্য ত্রৈলোক্যনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ধর্ম এবং অসাধুতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই গল্পটির অবতারণা।

শেষপর্যন্ত সাধুর টাকা-মোহর-সোনা ডবল করার প্রতিশ্রুতি। ডমরুধরের লোভ বশত পূজাপাঠ আরম্ভ। এইলোভের দুর্বলতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে সুযোগসন্ধানী সাধু সন্ন্যাসীর দল। অর্থাৎ সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিকে সম্বল ক'রে নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার আকাঙ্খা সাধারণ মানুষের মজ্জাগত। এরা যে নির্বোধ তাও নয়। এইসব সাধুদের ভন্ডামি ভারতবর্ষের মতো দেশে কোনো নতুন ঘটনা নয়। মানুষদের ভোলানো বা বশীভূত করার জন্য শুধু কথায় নয়, কিছু ছলা-কলা, জাদুকরী বিদ্যা তথা অপবিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়।

এইভাবে আলোচ্য গল্পে ভন্ড-প্রতারক সাধুর চরিত্র তুলে ধ'রে ত্রৈলোক্যনাথ বাঙালি সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণীর অলৌকিক ক্ষমতা তথা যাদুকরী বিদ্যার সাহায্যে ধনসম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। অন্যদিকে ঠাকুর—দেবতার নামে সাধারণ মানুষদের প্রতারিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার প্রবণতাকেও কটাক্ষ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ।

'গাছে-ঝোলা সাধু'গল্পে যে Black Magic বা বুজরুকির জাদুবিদ্যার উল্লেখ দেখি (মন্ত্রবলে টাকাপয়সা সোনাদানা দ্বিগুণ ক'রে দেবার টোপ) তা আমাদের গ্রামীণ বঙ্গদেশে একদা বহুলপ্রচলিত ছিল, এখনও যে এই অপবিদ্যা পুরোপুরি লুপ্ত হ'য়ে গেছে এমন নয়। সাধারণ গৃহস্থ মানুষ খুব সহজে রাতারাতি ধনী হ'তে চায়, সেজন্য নানাবিধ অপার্থিব শক্তি বা অলৌকিক ঘটনার ওপর তারা কায়মনে বিশ্বাস সমর্পণ করতে চায়। আর সাধারণ মানুষের এই লোভ বা দুর্বলতাকে ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা সহজেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে, গৃহস্থের সর্বস্ব নিয়ে রাতারাতি ভোজবাজির মতো উধাও হ'য়ে যায়। সাধারণ মানুষের এই দুর্বলচিত্ততা এবং ভন্ড সাধুদের এই বুজরুকির ব্যবসা ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর বিস্তৃত জীবনাভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গ্রামীণ জীবন, বিশেষ অর্থে লোকজীবন, লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কার সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর। আলোচ্য গল্পে সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। সেইজন্য 'গাছে-ঝোলা সাধু' গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষা এইসব বুজরুকি বা Black Magic— এর স্বরূপ চিনিয়ে দিতে চেয়েছে। ডমরুধর কোনো নিরীহ সাধারণ গৃহস্থ নয়, বুজরুকি বা ভন্ডামিতে সে-ও কম যায় না, তাই সাধু-র প্রস্তাব শুনে সে বলেছে—

"আমি নিতান্ত বোকা নই। এরূপ বুজরুকির কথা আমি অনেক শুনিয়াছি। গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দুই-একটি টাকা অথবা নোট ডবল করিয়া তোমরা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন কর। তোমাদের কুহকে পড়িয়া গৃহস্বামী ঘরের সমুদয় টাকাকড়ি গহনা-পত্র আনিয়া দেয়। হাঁড়ী অথবা বাক্সের ভিতর সেগুলি বন্ধ করিয়া তোমরা পূজা কর। পূজা সমাপ্ত করিয়া সাতদিন কি আটদিন পরে গৃহস্বামীকে খুলিয়া দেখিতে বল। সেই অবসরে তোমরা চম্পট দাও। যাও পরে গৃহস্বামীকে খুলিয়া দেখে। যে হাঁড়ী ঢন্‌ঢন্। বাজিকরের ও চালাকি আমার কাছে খাটিবে না।"[৩]

ঠিক এইভাবেই এই জাতীয় Black Magic এর কাছে সাধারণ মানুষ পর্যুদস্ত হয়, সর্বস্বান্ত হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই চালবাজি গ্রামীণ বঙ্গদেশে প্রচলিত হ'য়ে এসেছে। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর বহুদর্শী অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা এখানে বেছে নিয়েছেন মাত্র। ধর্মের নামে ভন্ডামি ও বুজরুকির বিরুদ্ধে অনেক গল্পেই তাঁর লেখনী শাণিত ও প্রতিবাদী। এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই গল্পের আর একটি পর্যবেক্ষণ আমাদের দৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ। তা হলো উচ্চশিক্ষিত তরুণদের এবং ইংরেজি পত্রিকার সাংবাদিকদের এইসব ধর্মীয় ভন্ডামি ও বুজরুকি নিয়ে অবাঞ্ছনীয় মাতামাতি। লেখক ঠিকই বলেছেন —'হুজুগ একটু পুরাতন হইলেই বাঙ্গালী পুনরায় নতুন হুজুগের সৃষ্টি করে। অথবা এই বঙ্গভূমির মাটির গুণে আপনা হইতেই নূতন হুজুগের উৎপত্তি হয়।"[৪]

সম্ভবতঃ উচ্চশিক্ষিত ('বি.এ. এম.এ পাস করা ছোঁড়ারা') যুবকরা প্রশ্নহীন বিশ্বাসে এই ভাবেই হুজুগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সভ্যতাগর্বী ইংরেজি কাগজের সাংবাদিকদের অধঃপতনও এই প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। উচ্চশিক্ষিত যুবাদের এই স্বধর্মচ্যুতি ও পশ্চাদপরায়ণতা লেখককে ব্যথিত করেছিল, আলোচ্য গল্পে তারই শ্লেষ-বিদ্ধ প্রতিফলন।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১.দ্র.'ডমরুচরিত'/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ সুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত/ পৃঃ-৪৫২
২. তদেব/পৃঃ-৪৫২
৩. তদেব/পৃঃ-৪৫৩
৪. তদেব/পৃঃ-৪৫২

তৃতীয় অধ্যায় (গ)

৩. (গ) ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের উপস্থাপনের কৌশল ও গল্প বলার ভঙ্গি

ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রৈলোক্য-প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানাতে গিয়ে আমরা তাঁর রচনারীতির দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি— একটি তাঁর গল্পের মজলিশী মেজাজ, অপরটি তাঁর গল্পকথনের ভঙ্গি।

ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্পই বৈঠকী ঢঙে রচিত, মজলিশী মেজাজ বা আড্ডার মেজাজই এসব গল্পের বৈশিষ্ট্য। গল্প কখনো বলছে ডমরুধর, কখনো বা নয়নচাঁদ, আবার কখনো সুবল গড়গড়ি। বস্তুতঃ বাংলাসাহিত্যে আড্ডার মেজাজ বা বৈঠকী ঢঙ, কথাসাহিত্য উন্মেষের পর্বে, ত্রৈলোক্যনাথই প্রথম আমদানী করেন। সমালোচক শিশিরকুমার দাশ যথার্থই বলেছেন—

"ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত রচনারীতিকেই তাই বৈঠকী রীতি বা মৌখিক গল্পধারার অনুসৃতি বলা চলে।.... বাংলাদেশের এই ধারাটি লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের হাতেই প্রথম চরম মর্যাদা পেল এবং তাঁর সাহিত্যরীতি বিচারের প্রথম সূত্রই হল এই বৈঠকী রীতি।"[১]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম মর্যাদা প্রবর্তয়িতার। বাংলাদেশে যে মৌখিক গল্পের ধারা এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বহুদিন যাবৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, ত্রৈলোক্যনাথ সর্বপ্রথম তাকে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে গ্রন্থিবদ্ধ ও সুসজ্জিতরূপে পরিবেশন করেন। আর এজন্যেই তাঁকে বৈঠকী রীতি বা মজলিশী পরিবেশন-পদ্ধতি বেছে নিতে হয়েছে।

মজলিশ বা আড্ডার সঙ্গে আজগুবী বা উদ্ভট প্রসঙ্গের অঙ্গাঙ্গী যোগ। বাংলায় বহুদিন যাবৎ লোকপ্রচলিত গল্পধারার মধ্যেও এই আজগুবী উদ্ভট ঘটনার উপাদান নিহিত ছিল। জমাট গল্প বলে শ্রোতাকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে-এটাই যখন গল্পকথকের অভীষ্ট লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়ায় তখন গল্পের মধ্যে আজগুবী বা অবিশ্বাস্য প্রসঙ্গ সহজেই ঢুকে পড়ে। মৌখিক গল্পকথনের এই রীতি অনুসরণ করতে গিয়েই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে আপাত অবিশ্বাস্য নানা আজগুবী ঘটনা ঢুকে পড়েছে। পাঠক নিজেকে শ্রোতার ভূমিকায় স্থাপন ক'রে সেইসব বৈঠকী গল্প যখন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে, তখন আজগুবী বা উদ্ভট প্রসঙ্গের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আর প্রশ্ন করে না। বরং এক ধরনের অনাস্বাদিতপূর্ব 'উদ্ভট রস' উপভোগ করে। আরব্যরজনীর গল্পে যেমনটি হয়। আর এর মধ্যেই ত্রৈলোক্যনাথ সুচারু কৌশলে তাঁর হিউমার বা স্যাটায়ার চারিয়ে দেন তাঁর গল্পের মধ্যে। ফলে, আজগুবী বা উদ্ভট প্রসঙ্গই কখনো কখনো তাঁর গল্পে হ'য়ে ওঠে ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্রের মতো। তা পাঠককে মুগ্ধও করে, আবার ব্যঙ্গ-বিদ্ধ ও করে (উদ্দিষ্ট শ্রেণী বিশেষে)। এইভাবে ত্রৈলোক্যনাথ মৌখিক গল্পের ঐতিহ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে এক বিচিত্র আস্বাদনের বৈঠকী গল্পের অবয়ব গড়ে তোলেন— যার মধ্যে উপভোগ্যতা ও উদ্দেশ্যমূলকতা পাশাপাশি নির্বিরোধে সহাবস্থান করতে পারে।

এইসূত্রেই বলতে হয় ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের ভূত-প্রেতের প্রসঙ্গ। তাঁর গল্পে যেমন বাঘের পেটের ভিতরে বসে চিঠি লিখে পরে সেই চিঠির সূত্রেই উদ্ধার পাওয়া যায়, ভূমিকম্প-বিক্রেতাকে এক-টাকা দিলেই ভূমিকম্প ঘটিয়ে দেওয়া যায়, কুমীরের পেটের ভিতরে জীবন্ত সাঁওতাল রমণীকে বেগুন বিক্রি করতে দেখা যায় ঠিক তেমনিভাবেই ভূত, প্রেত বা জিন-এর উপস্থিতি (ডমরুধর সিরিজের সপ্তম গল্প) লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই ভূতপ্রেত-এর উপস্থিতি প্রায় একটি অনিবার্য শিল্পকৌশলরূপে দেখা দেয়। এই ভূতেরা নানা অভিনব ঘটনাও ঘটিয়ে দেয়। কখনো ভূতেদের দ্বারা সংঘটিত ঘটনাগুলি গল্পকে জমিয়ে তুলতে সাহায্য করে, কখনো বা গল্পের প্রবাহমধ্যে মজাদার জটিলতা সঞ্চার করে, কখনো আবার তা মধুর মিলনান্তক পরিণতির দিকে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৈঠকী পরিবেশে এইসব ভূতপ্রেতের প্রসঙ্গ শ্রোতাদের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কিছুটা যেন অলস মন্থর শিথিল উপভোগ্যতার অপরিহার্য শর্তরূপেই এদের আগমন। আসলে এই ধরনের গল্পগুলি সরস হয়েও নির্দোষ। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ হাস্যরস—প্রধান সাহিত্যে এমন নির্দোষ রসিকতা অনাস্বাদিতপূর্ব।

বৈঠকী রীতিতে মৌখিক গল্পকথনের ঐতিহ্যকে অনুসরণ ক'রে ত্রৈলোক্যনাথ যেভাবে জমিয়ে গল্প বলেছেন, তাতে ভূত-প্রেত ও নানা আজগুবী প্রসঙ্গ তথা ফ্যান্টাসির ঘটনা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ব'লে তাঁর গল্পের আয়তন এমনিতেই কিছুটা বেড়ে গেছে। তাঁর গল্পগুলি এতবেশি উপপরিচ্ছদ বা উপশিরোনামে বিন্যস্ত যে মাঝে মাঝে মনে হয় মূল গল্পটিই বুঝি বা পথ হারালো! আরব্যরজনীর যেমন, গল্পের ভিতরে গল্প, তার মধ্যে আবার শাখা বা উপ-গল্প, এবং এর প্রত্যেকটি গল্প এক একটি পৃথক রজনীতে কথিত বা পরিবেশিত হয়েছে, ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলিও তেমনি! 'মুক্তামালা'র গল্পগুলি এ' প্রসঙ্গে মনে পড়বে। 'মুক্তামালা' সিরিজে পাঁচটি গল্প আছে, কিন্তু এর উপ-পরিচ্ছেদ অনেকগুলি, সবগুলিই পৃথক পৃথক রাত্রে ক্রমপরম্পরা বজায় রেখে পরিবেশিত হয়েছে সুবল গড়গড়ির মুখে। এইভাবে তাঁর গল্পের আয়তন স্বাভাবিক

স্বতঃস্ফূর্ততায়, গল্পের নিজস্ব টানে বেড়ে যায়। তার মধ্যে একধরনের নমনীয়তাগুণ সঞ্চারিত হয়। ফলে তাঁর গল্পকে নিছক 'গল্প', 'ছোটগল্প' বা 'বড়গল্প' নামে প্রচলিত প্রকরণগত অভিধায় চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। তাঁর গল্পগুলি হ'য়ে ওঠে গল্পমালা— গল্পের ভিতরে গল্প, তার মধ্যে আরও গল্প এইরকম নানা গল্পের সমাহারে হ'য়ে ওঠে এক বিচিত্র রসাস্বাদনের গল্পমালা। এ প্রসঙ্গে আরও বলা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্য ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও শিল্পশর্ত অনুযায়ী তাঁর গল্পের শৈল্পিকতা বিচার্য নয়। কারণ তিনি একেবারে ভিন্নধরনের লিখনশৈলী অবলম্বন করেছেন। তবে সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী তাঁর সব গল্পকেই একজাতীয় 'বড়গল্প' বলা যেতে পারে। আড্ডার পরিবেশে জমিয়ে গল্প বলতে গিয়ে তাঁর গল্প যে কখন গল্পের সীমা লঙঘন ক'রে 'কাহিনি'র অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে, সে-ব্যাপারে তাঁরও সবসময় খেয়াল থাকত না।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প বলার ভঙ্গিটি কথকতার ভঙ্গি। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বাংলাদেশে বহুকাল প্রচলিত মৌখিক গল্পকথনের ঐতিহ্যটি তিনি তাঁর লিখনশৈলীর মধ্যে আত্মস্থ ক'রে নিয়েছিলেন। সেজন্যই ত্রৈলোক্যনাথকে 'গল্পলেখক' অপেক্ষা 'গল্পকথক' বলা অধিকতর সঙ্গত। ড. শিশিরকুমার দাশ এ'প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"ত্রৈলোক্যনাথকে গল্পলেখক অপেক্ষা গল্প 'কথক' বলা চলে। তাঁর গল্পগুলি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি এক অদৃশ্য বৈঠক কল্পনা করেছেন এবং তাদেরই উদ্দেশ্যে তিনি গল্প বলে চলেছেন। কথোপকথনের ভঙ্গীটি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।"[২]

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির নিবিড় পাঠ গ্রহণ করলে তাঁর গল্প থেকে কথনভঙ্গির যে কাঠামোটি পাওয়া যায়, তাতে বোঝা যায় যে তিনি মনে মনে একটি অদৃশ্য মজলিশ কল্পনা ক'রে নিয়েছেন এবং সেই বৈঠকী মজলিশের উদ্দেশ্যেই তিনি গল্পটি বলে চলেছেন। এটা কখনোই একটানা একপক্ষীয় (monotonous) কথন নয়, তার মধ্যে 'অপর' (other) -এর অংশগ্রহণও রয়েছে, অর্থাৎ সংলাপ বিনিময়ের ভিত্তিতে কথোপকথনের একটা আদল তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি থেকে পাওয়া যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে-সময়ে তিনি তাঁর এই মৌলিকতার দ্যোতক গল্পগুলি লিখেছেন, তখন বঙ্কিম-প্রতিভা অস্তমিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'হিতবাদী' পর্যায়ের গল্পগুলি সবেমাত্র প্রকাশিত হ'তে শুরু করেছে। একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম শিল্পসম্মত বাংলা গল্পের স্রষ্টা, ত্রৈলোক্যনাথ লিখতে এসেছেন তাঁরই সমকালে—কিন্তু দু'জনের গল্প বলার ভঙ্গি ও উপস্থাপনের কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সেই ভঙ্গিতে যা ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'ছোটগল্প' অভিধায় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সে-গল্পের গড়ন এবং রসাস্বাদ কখনো একাঙ্ক নাটক কখনো বা লিরিক কবিতার সমধর্মী। মোটকথা, নবজাগরণের ভাবস্পর্শে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য রচনারীতিকে তাঁর দেশীয় চেতনার মধ্যে গ্রহণ ক'রে তার এক নবরসায়নজাত শৈল্পিক রূপ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, শৈলীর বা রচনারীতির ব্যাপারে ত্রৈলোক্যনাথ আগাগোড়া পূর্বের তথা এশিয়ার গল্পকথনের মৌখিক ঐতিহ্যকে তাঁর লিখনশৈলীর মধ্যে আত্মস্থ ক'রে দেশীয় ছাঁচে গল্প বলতে চেয়েছেন। গল্প লেখা আর গল্প বলা এই দুই ভঙ্গির মধ্যে যদি কোনো পৃথগীকরণের রেখা টানা যায় তাহ'লে প্রথম মেরুতে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় মেরুতে ত্রৈলোক্যনাথের অবস্থান কল্পনা ক'রে নেওয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্প বলার বিষয় (content) এবং পরিবেশনভঙ্গি (style of presentation) সম্পর্কে এতটাই দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ কোনো লেখকই তাঁকে প্রভাবিত করেনি। এ'প্রসঙ্গে ড. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"বঙ্কিম যুগের অবসানকালে ও রবীন্দ্র-যুগের সূচনাকালে ত্রৈলোক্যনাথ গল্প লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্প লেখেননি, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সূচনা ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। হিতবাদী সাধনা ভারতী নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে গল্পগুচ্ছের প্রথম দু'খন্ডের গল্পসমূহ প্রকাশিত হয়। এ সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্প লেখেন। দুজনের গল্প পাশাপাশি রেখে আমরা এই অনায়াস সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে রবীন্দ্র গল্প-ভাবনা ও শিল্প-রূপ ত্রৈলোক্যনাথকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। আসলে শিল্পভাবনায় দুজনে ভিন্ন জগতের অধিবাসী ছিলেন। গল্পগুচ্ছের প্রথম দুখন্ডের গল্পে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে নিগূঢ় সৌহার্দ্য, যে সৌন্দর্যব্যাকুলতা, তার সঙ্গে ত্রৈলোক্য-গল্পরাজির কোনো সম্পর্ক নেই।"[৩]

এই কথকতার সূত্রে ত্রৈলোক্যনাথের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অর্জন হলো কাহিনির অনিঃশেষিত দৈর্ঘ্য। এ'প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি— তাঁর গল্প কখন যে গল্পের বেঁধে— দেওয়া গন্ডি লঙঘন ক'রে কাহিনির এলাকায় ঢুকে পড়ে, কখন যে তাঁর কথন জমজমাট 'কাহিনি' হ'য়ে ওঠে সে-ব্যাপারে তিনিও সর্বদা সতর্ক থাকতে পারতেন না। একটি গল্প শেষ হলেই শুরু হ'য়ে যায় আরেকটি গল্প। এ'যেন গল্প-শৃঙ্খল বা গল্প-মালা।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পমালার আকাশ উদ্ভট কল্পনার, Fantasy বা আজগুবী ব্যাপারস্যাপার তাঁর গল্পের উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে, কিন্তু গল্পের মূল দৃঢ়ভাবে বাস্তব পটভূমিতে প্রোথিত। যে পদ্ধতিতে তিনি গল্প বলেছেন, অর্থাৎ তাঁর গল্পে যেসব উপাদান কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়েছে— যেমন ভূতপ্রেত, শাঁকচুন্নী, স্বর্গ-নরক, স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে মানবাত্মার সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ, স্বপ্ন, উদ্ভট ঘটনাবলী, ভৌতিক কান্ডসমূহ এগুলি সবই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো ভূতপ্রেত বা ফ্যান্টাসির ঘটনাবলীই তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার বা বক্তব্যের বাহন হ'য়ে ওঠে। এ'প্রসঙ্গে ড. শিশিরকুমার দাশের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি— 'ত্রৈলোক্যনাথের ভূতপ্রেত, স্বপ্ন ইত্যাদি অবাস্তব ব্যাপারগুলিও তাঁর

ব্যঙ্গের পথ। তাঁর ব্যঙ্গ দুটি পথ নিয়েছে। কখনও ভূতপ্রেত বা জীবজন্তুর মধ্যে— কখন ও স্বয়ং মানব-চরিত্রের মধ্য দিয়ে।"[৪]

ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আমরা যেহেতু পঞ্চম অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করব, তাই বর্তমান তৃতীয় অধ্যায়ের উপসংহার এখানেই সঙ্গত বলে বিবেচনা করছি।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১.দ্র. বাংলাছোটগল্পঃ ১৮৭৩-১৯২৩/ কলকাতা, ১৯৮৩/ পৃঃ-১৩৫
২. তদেব/ পৃঃ-১৩৪
৩. দ্র. কালের পুত্তলিকা/ কলকাতা/পৃঃ-১২৮
৪. দ্র. বাংলাছোটগল্পঃ ১৮৭৩-১৯২৩/ পৃঃ-১৩৯